Nirbason by Humayun Ahmed

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

নির্বাসন
হুমায়ূন আহমেদ
www.MurchOna.com
মূর্ছনা

মূর্ছনা
www.MurchOna.com
Archives of eBooks, Music & Videos
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
suman_ahm@yahoo.com

নির্বাসন

রাত্রিতে তাঁর ভালো ঘুম হয় নি।

বার বার ঘুম ভেঙেছে--তিনি ব্যস্ত হয়ে ঘড়ি দেখেছেন। না, এখনো রাত কাটে নি। এক বার হিটার জ্বালিয়ে কফি বানালেন, কিছুক্ষণ পায়চারি করে এলেন ছাদে। আবার বিছানায় ফিরে গিয়ে ঘুমুতে চেষ্টা করলেন। ছাড়া-ছাড়া ঘুম, অর্থহীন এলোমেলো স্বপ্ন দেখে আবার ঘুম ভাঙল।

ভোর হতে আর কত দেরি? আকাশে সামান্য একটু আলোর রেখা কখন ফুটবে? কা-কা করে কাক ডাকছে। অন্ধকার একটু যেন ফিকে হয়ে গেল। আর হয়তো বেশি দেরি নেই। তিনি এই শীতেও ঘরের দরজা-জানালা সব খুলে দিলেন। জানালার সমস্ত পর্দা গুটিয়ে ফেললেন। অন্ধকারে কিছুই নজরে আসছে না। কিন্তু তিনি বাতি জ্বালালেন না। হাতড়ে-হাতড়ে ইজিচেয়ারটি খুঁজে বের করলেন। এখানে শুয়ে থেকেই রেডিওগ্রামের সুইচ নাগাল পাওয়া যায়। রেডিওগ্রামে সানাইয়ের তিনটি লং-প্লেইং রেকর্ড সাজান আছে। সুইচ টিপলেই প্রথমে বেজে উঠবে বিসমিল্লাহ্ খাঁর মিয়া কি টৌড়ি। তিনি সুইচে হাত রেখে ভোরের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর বহু দিনের স্বপ্ন জরীর বিয়ের দিনের ভোরবেলায় সানাইয়ের সুর শুনিয়ে সবার ঘুম ভাঙাবেন। ঘুম ভাঙতেই সবাই যেন বুঝতে পারে--জরী নামের এ বাড়ির একটি মেয়ে আজ চলে যাবে।

বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ তাঁর চোখে জল এল। বয়স হবার পর থেকে এই হয়েছে। কারণে-অকারণে চোখ ভিজে ওঠে। সুখ এবং দুঃখের অনুভূতি বড়ো তীব্র হয়ে বুকে বাজে।

একতলায় কার যেন পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ঘটাং ঘটাং শব্দে টিউবওয়েলে কেউ এক গুন পানি তুলছে। মোরগ ডাকছে। ভোর হল বুঝি। তিনি সুইচ টিপলেন।

সানাই শুনলে এমন লাগে কেন? মনে হয় বুকের মাঝখানটা হঠাৎ ফাঁক হয়ে

www.murchona.com
suman_ahm@yahoo.com

গেছে। তাঁর অদ্ভুত এক রকমের কষ্ট হতে লাগল। তিনি ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। হু-হু করে শীতের হিমেল বাতাস বইছে। এবার বড়ো আগেভাগে শীত পড়ে গেল। খুব শীত পড়লেই তাঁর ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। স্পষ্ট দেখতে পান, কমলালেবু হাতে সাত-আট বছরের একটি বাচ্চা ছেলে বারান্দায় বসে হু-হু করে কাঁপছে। আজও তাঁর ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল। আহ্ পুরানো কথা ভাবতে এত ভালো লাগে। তিনি মনে মনে বললেন, 'ভাগ্যিস জন্তু-জানোয়ার না হয়ে মানুষ হয়ে জন্মেছি।'

জরী কি এখনো ঘুমুচ্ছে? আজ ঘুম ভাঙলে তার কেমন লাগবে কে জানে? তাঁর খুব ইচ্ছে হচ্ছে জরীকে ঘুম ভাঙিয়ে নিয়ে আসেন। সে আজ তাঁর সঙ্গে ছাদে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখুক। দেখুক, খুব ভোরে চেনা পৃথিবী কেমন অচেনা হয়ে পড়ে। হালকা কুয়াশায় ঢাকা শীতের সকালে কী অপরূপ সূর্যোদয় হয়।

কিন্তু জরীটা বড্ড ঘুমকাতুরে। তিনি কত চেষ্টাই না করেছেন সকালে জেগে ওঠার অভ্যাস করাতে। সে বরাবর আটটার দিকে উঠেছে। বিছানা না ছেড়েই চিৎকার, 'ও মা চা দাও, ও মা চা দাও।' বাসিমুখে চায়ে চুমুক দিতে দিতে সে উঠে এসেছে দোতলায়। তিনি হয়তো ততক্ষণ রেওয়াজ শেষ করে উঠবেন উঠবেন করছেন। জরী হাসিমুখে বলেছে, 'বড়োচাচা, আজ আপনার গান শুনতে পারলাম না।'

তিনি বিরক্ত হয়ে বলেছেন, 'দশটায় ঘুম ভাঙলে কী গান শুনবে জরী? আমার গান শুনতে হলে রাত কাটার আগে উঠতে হবে।'

'কাল ঠিক উঠব বড়োচাচা। এই আপনার সেতার ছুঁয়ে বলছি।'

বলতে বলতেই সেতারের তারে টোকা দিয়েছে জরী। 'গাঁও' করে একটি গম্ভীর আওয়াজ উঠেছে। শুনে জরীর সে কি হাসি।

তিনি মনে মনে বললেন, আজ শুধু জরীর কথা ভাবব। তিনি জরীর মুখ মনে করতে চেষ্টা করলেন। আশ্চর্য, মনে আসছে না তো? এ রকম হয়। খুব ঘনিষ্ঠ লোকজন, যারা সব সময় খুব কাছাকাছি থাকে, হঠাৎ করে তাদের মুখ মনে করা যায় না। তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে ছাদে উঠে গেলেন।

এ বাড়ির ছাদটি প্রকাণ্ড। ছাদের চারপাশে বড়ো বড়ো ফুলের টবে অযত্নে কিছু গোলাপ-চারা বড়ো হচ্ছে। তিনি ছাদের কার্নিশে ঝুঁকে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে সামনে হাত বাড়ালেন। ছাদের এ দিকটায় দু'টি প্রকাণ্ড আমগাছ দিনের বেলাতেও অন্ধকার করে রাখে। চারদিকে অন্ধকার ফিকে হয়ে এলেও এখানে কালো রঙ জমাট বেঁধে আছে। কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। শীতকালে আমের মুকুল হয় নাকি?

'বড়ো চাচা।'

তিনি চমকে পিছনে ফিরলেন। আশ্চর্য! জরী দাঁড়িয়ে আছে তাঁর পেছনে। ঘুম-জড়ান ফোলা ফোলা মুখ। মেয়েটিকে আজ বড়ো অচেনা মনে হচ্ছে। এত রূপসী

www.murchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

তো জরীকে কখনো মনে হয় নি। বিয়ের আগের দিন সব মেয়ে নাকি গুটিপোকার মতো খোলস ছেড়ে প্রজাপতি হয়ে বেরিয়ে আসে। তিনি হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে রইলেন।

'বড়োচাচা, কী করছেন একা একা?'

'সানাই শুনছি।'

'আজ আমি খুব ভোরে উঠেছি। আপনি খুশি হয়েছেন চাচা?'

তিনি হাসলেন। জরী একটা হলুদ রঙের চাদর গায়ে জড়িয়েছে। একটু একটু কাঁপছে শীতে?

'জরী, তোর শীত লাগছে?'

'উঁহু। আপনি আজ রেওয়াজ করবেন না চাচা?'

'না মা। আজ আমার ছুটি।'

দু' জনে খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। জরী অস্ফুট স্বরে বলল, 'ইস, কী কুয়াশা পড়েছে বাবা!'

তিনি একসময় বললেন, 'সানাই শুনতে ভালো লাগছে জরী?'

'লাগছে।'

'কে বাজাচ্ছে জান?'

'জানি না, কে বাজাচ্ছে।'

'বিসমিল্লাহ্ খাঁ, এখন বাজছে মিয়া কি টৌড়ি।'

জরী আরো কাছে সরে এসে কার্ণিশে ভর দিয়ে দাঁড়াল। মৃদু গলায় বলল, 'কী সুন্দর লাগছে! আগে জানলে রোজ ভোরে উঠতাম।'

তিনি জরীর দিকে তাকিয়ে সস্নেহে হাসলেন। জরী বলল, 'একটা হালকা সুবাস পাচ্ছেন বড়োচাচা?'

'পাচ্ছি।'

'বলুন তো কিসের?'

তিনি ভাবতে চেষ্টা করলেন। শিউলি ফুলের নাকি? বাগানে একটি শিউলিগাছ আছে। কিন্তু সে-ফুলের গন্ধ তো হালকা।

এতক্ষণে সূর্য উঠল। গাছে গাছে কাক ডাকছে। কিচির-মিচির করতে করতে দু'টি শালিক এস বসল ছাদে। জরী হাত বাড়িয়ে দু'টি আমের পাতা ছিঁড়ে এনে গন্ধ শুঁকল। তিনি দেখলেন জরী কাঁদছে। তিনি চুপ করে রইলেন। আহা একটু কাঁদুক। এমন একটি সময়ে না কাঁদলে মানায় না। তাঁর ভীষণ ভালো লাগল। তিনি কোমল গলায় বললেন, 'জরী, দেখ সূর্য উঠেছে। এমন সুন্দর সূর্যোদয় কখনো দেখেছিস?'

জরী চোখ মুছে ধরা গলায় বলল, 'সান্তাহার যাবার সময় এক বার ট্রেনে দেখেছিলাম।'

'দেখ, আজকে আবার দেখ।'

www.MurchOna.com

জরী ফিসফিস করে বলল, 'কী সুন্দর!'

বলতে বলতে জরী আবার চোখ মুছল। তিনি নরম গলায় বললেন, 'বোকা মেয়ে, আজকের দিনে কেউ কাঁদে? ঐ দেখ দু'টি শালিক পাখি। দুই শালিক দেখলে কী হয় মা?'

জরী ফিসফিস করে বলল, 'ওয়ান ফর সরো, টু ফর জয়।'

ঠিক তখনি জরীর বন্ধুরা নিচ থেকে 'জরী জরী' করে চেঁচাতে লাগল। জরী নিঃশব্দে নিচে নেমে গেল।

তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। ভোরের এরকম অচেনা আলোয় মন বড়ো দুর্বল হয়ে যায়। আপনাকে ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। বড়ো বেশি মনে পড়ে, দিন ফুরিয়ে গেল। তিনি সুর করে পড়লেন--'ফাবিআয়ে আলা রাব্বিকুমা তুকাজ জি বান।'

কাল রাতে চার বান্ধবী জরীকে নিয়ে একখাটে ঘুমিয়েছিল। এরা অনেক দিন পর একসঙ্গে হয়েছে। লায়লার সঙ্গে জরীর দেখা হয়েছে প্রায় চার বছর পর। আভা ও কনক ময়মনসিংহ থাকলেও দেখাসাক্ষাৎ প্রায় হয় না বললেই চলে। রুনু জরীর দূরসম্পর্কের বোন। স্কুলের পড়া শেষ হবার পর একমাত্র তার সঙ্গেই জরীর রোজ রোজ দেখা হ'ত। পুরনো বন্ধুদের মধ্যে শেলী ও ইয়াসমীন আসে নি।

অনেক দিন পর মেয়ে বন্ধুরা একত্রিত হলে একটা দারুণ ব্যাপার হয়। আচমকা সবার বয়স কমে যায়। প্রতিনিয়ত মনে হয় বেঁচে থাকাটা কী দারুণ সুখের ব্যাপার!

জরীর বন্ধুরা গত পরশু থেকে ক্লান্তিহীন হৈচৈ করে যাচ্ছে। গুজগুজ করে খানিকক্ষণ গল্প, পরমুহূর্তেই উচ্ছ্বসিত হাসি। আবার খানিকক্ষণ গল্প, আবার হাসি। এক জনকে হয়তো দেখা গেল হঠাৎ কী কারণে দল ছেড়ে দৌড়ে পালাচ্ছে। তার পিছনে পিছনে ছুটছে বাকি সবাই। খিলখিল হাসির শব্দে সচকিত হয়ে উঠছে বাড়ির লোকজন।

গতরাতটা তাদের জেগেই কেটেছে। আভা তার প্রেমের গল্প বলেছে রাত একটা পর্যন্ত। তার প্রেমিকটি এক জন অধ্যাপক। আভার বর্ণনানুসারে দারুণ স্মার্ট ও খানিকটা বোকা। সে তার স্মার্ট প্রেমিকটির দু'টি চিঠিও নিয়ে এসেছিল বন্ধুদের দেখাতে। কাড়াকাড়ি করে দেখতে গিয়ে সে চিঠির একটি ছিঁড়ে কুটিকুটি। অন্যটি থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবাই বানান ভুল বের করতে লাগল। এক-একটি ভুল বের হয়, আর আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে সবাই।

মাঝরাতে লায়লার হঠাৎ চা খাবার ইচ্ছে হল। কনক বলল, 'চমৎকার, চল সবাই--ছাদে বসে চা খাই।'

রুনু রাজি হল না। তার নাকি ঘুম পাচ্ছে। সে বলল, 'এই শীতে ছাদে কেন?

এখানেই তো বেশ গল্পগুজব করছিস।'

কনক বলল, 'ছাদে আমি গান শোনাব।' সঙ্গে সঙ্গে দলটি চেঁচিয়ে উঠল। গত দু' দিন ধরেই কনককে গাইবার জন্যে সাধাসাধি করা হচ্ছে। লাভ হয় নি। কনক কিছুতেই গাইবে না। লায়লা এক বার বলেই ফেলল, 'একটু নাম হয়েছে, এতেই এত তেল? টাকা না পেলে আজকাল তুই আর গাস না?'

কনক কিছু বলে নি, শুধু হেসেছে।

ধুপধাপ শব্দ করে সবাই যখন ছাদে উঠল, তখন নিশীথ রাত। চারদিকে ভীষণ অন্ধকার। জরী বলল, 'দুর ছাই, জোছনা নেই। আমি ভেবেছিলাম জোছনা আছে।'

আভা বলল, 'আমার ভয় করছে ভাই, গাছের ওপর ওটা কি?'

'ওটা হচ্ছে তোর অধ্যাপক প্রেমিকের এঞ্জেল বডি। তোকে দেখতে এসেছে।'

সবাই হো হো করে হেসে উঠল। এই হাসির মধ্যেই গান শুরু করল কনক, 'সঘন গহন রাত্রি...'

গান শুরু হতেই সবাই চুপ করে গেল। আভা চাপা গলায় বলল, 'কী সুন্দর গায়। বড়ো হিংসা লাগে।'

কনকের গলা খুব ভালো। ছোটবেলায় কিন্তু কেউ বুঝতে পারে নি, অল্প সময়ে কনকের এত নাম–ডাক হয়ে যাবে। রেডিওতে প্রথম যখন গায় তখন সে কলেজে পড়ে। তার পরপরই তার গানের প্রথম ডিস্ক বের হয়--যার এক পিঠে 'আমি যখন তাঁর দুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই' অন্য পিঠে 'ওগো শেফালী বনের মনের কামনা'।

কনক পরপর চারটি গান গাইল। গানের মাঝখানে জরীর মা চায়ের পট নিয়ে মৃদু অনুযোগের সুরে বললেন, 'নাও তোমাদের চা। এত রাত্রে ছাদে গান–বাজনা কি ভালো? চা খেয়ে ঘুমুতে যাও সবাই।'

কেউ নড়ল না। রুনু বলল, 'কনক, আজ সারা রাত তোমাকে গাইতে হবে।'

জরীর মা–ও এক পাশে বসে পড়লেন। জরীর বড়োচাচাও উঠে এলেন ছাদে। আসর যখন ভাঙল তখন রাত দুটো। জরীর বড়োচাচা বললেন, 'বড়ো ভালো লাগল মা, বড়ো মিঠা গলা। জরীর গলাও ভালো ছিল। কিন্তু সে তো আর শিখল না।'

আভা বলল, 'এখন শিখবে।'

সবাই খিলখিল করে হেসে উঠল। কনক বলল, 'আপনার একটা গান শুনি?'

'অন্য দিন, আজ অনেক রাত হয়েছে। তোমরা ঘুমুতে যাও।'

সে--রাতে কারোরই ভালো ঘুম হল না। জরীর বড্ড মন কেমন করতে লাগল। তার ইচ্ছে করল মার কাছে গিয়ে ঘুমোয়। কিন্ত সে মড়ার মতো পড়ে রইল। আভা একবার ডাকল, 'জরী, ঘুমিয়েছিস?' জরী তার জবাব দিল না। একসময় ঘুমিয়ে পড়ল সবাই। শুধু জরী জেগে রইল। বিয়ের আগের রাতে কোনো মেয়ে কি আর ঘুমুতে পারে?

www.MurchOna.com

ইনিয়ে বিনিয়ে ভৈরবীর সুরে সানাই বাজছে। যে–সুরটি ওঠানামা করছে সেটি যেন একটি শোকাহত রমণীর বিলাপ। অন্য যে–সুরটি ক্রমাগত বেজে যাচ্ছে সেটি যেন বলছে--কেঁদো না মেয়ে, শোন, তোমাকে কী চমৎকার গান শোনাচ্ছি।

জরীর বন্ধুদের ঘুম ভেঙেছে। জরী ঘরে নেই। লায়লা গাঢ় স্বরে ডাকল, 'ও কনক, কনক।'

'কি?'

'সানাই শুনছিস?'

'শুনছি।'

'ভালো লাগছে তোর?'

'না। খুব মন খারাপ করা সুর।'

তারা সবাই ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। আভা গলা উঁচিয়ে ডাকল, 'জরী, জরী।' জরী ছাদ থেকে আসতেই সবাই দেখল, তার চোখ ঈষৎ রক্তাভ ও ফোলা ফোলা। রুনু বলল, 'রাতে তোর ঘুম হয় নি, না রে?'

'খুব হয়েছে।'

'এখন তোর কেমন লাগছে জরী?'

'কেমন আর লাগবে। ভালোই। আয়, বাগানে বেড়াতে যাই।'

তারা বাগানে নেমে গেল। এ–বাড়ির বাগানটি পুরনো। জরীর দাদার খুব ফুলের শখ ছিল। মালী রেখে চমৎকার বাগান করেছিলেন। বসরাই গোলাপের প্রকাণ্ড একটি ঝাড় ছাড়া এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। বাড়ির সর্ব–দক্ষিণে বেশ কিছু হাস্নুহেনাগাছ আছে। সেখানে হাঁটু উঁচু বড়ো বড়ো ঘাস গজিয়েছে। ওদিকটায় কেউ যায় না।

আভা বলল, 'এত সুন্দর বাগান, কেউ যত্ন করে না কেন রে?'

জরী বলল, 'বাগানের শখ নেই কারো। এক পরী আপার ছিল, সে তো আর থাকে না এখানে।'

লায়লা বলল, 'পরী আপা কি আগের মতো সুন্দর আছে?'

'এলেই দেখবি।'

'কখন আসবেন?'

'সকাল সাড়ে আটটায়, ময়মনসিংহ এক্সপ্রেসে।'

কনক বলল, 'এত বড়ো গোলাপ হয় নাকি, আশ্চর্য! জরী, গোলাপ তুলব একটা?'

'তোল না।'

চার জন অলস ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সবাই কিছু পরিমাণে গম্ভীর। লায়লা ঘনঘন কাশছে। কাল রাতে তার ঠাণ্ডা লেগেছে। কনকের দেখাদেখি সবাই গোলাপ ছিঁড়ে খোঁপায় গুঁজেছে। আভা হঠাৎ করে বলল, 'তোদের এখানে বকুলগাছ

নেই, না?'

'উঁহু।'

'আমার হঠাৎ বকুলফুলের কথা মনে পড়ছে। আমাদের স্কুলের বকুলগাছটার কথা মনে আছে তোদের?'

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল। স্কুলের বকুলগাছটা নিয়ে অনেক মজার মজার ব্যাপার আছে।

জরীর মা দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে মেয়েদের দেখছিলেন। তিনি সেখান থেকে চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'ও জরী, জরী।'

'কী মা?'

'কী করছিস তোরা?'

কনক বলল, 'বেড়াচ্ছি--আপনিও আসুন না খালাম্মা।'

জরীর মা হাসিমুখে নেমে এলেন। মনে হল মেয়েদের দলে এসে তাঁর বয়স যেন হঠাৎ করে কমে গিয়েছে। তিনি খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, 'গত রাতে একটা মজার স্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম, জরী যেন খুব ছোট হয়ে গিয়েছে। ফ্রক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাগানে। আর জেগে দেখি সত্যি তাই।'

'বললেই হল। আমি বুঝি ফ্রক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছি?'

জরীর মা হাসতে লাগলেন। হালকা গলায় বললেন, 'আমার যখন বিয়ে হয়, তখন এ বাগানটা আরো বড়ো ছিল। আমি রোজ সকালে এখানে এসে একটা করে ফুল খোঁপায় গুঁজতাম।'

বলেই তিনি হঠাৎ লজ্জা পেয়ে গেলেন। লায়লা বলল, 'আসুন খালা, আজ আপনার খোঁপায় ফুল দিয়ে দি।'

'কী যে বল মা, ছিঃ ছিঃ!'

কিন্তু ততক্ষণে কনক একটি ফুল ছিঁড়ে এনেছে। জরীর মা আপত্তি করবার আগেই তারা সেটি খোঁপায় পরিয়ে দিল। তিনি বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, 'আমি তোমাদের চায়ের যোগাড় করি। আর দেখ, হাসনুহেনা-ঝাড়ের দিকে যেয়ো না। খুব সাপের আড্ডা ঐদিকে।'

'শীতকালে সাপ কোথায় খালা?'

'না থাক, তবুও যাবে না।'

জরীর মা চলে যেতেই আভা বলল, 'খালা এখনো যা সুন্দর, দেখলে হিংসা লাগে।'

'পরী আপাও ভীষণ সুন্দর। তাই না জরী?'

'হ্যাঁ। আর আমি কেমন?'

'পরী আপা ফার্স্ট ক্লাস হলে তুই ইন্টার ক্লাস, আর আমাদের কনক হচ্ছে এয়ারকণ্ডিশণ্ড ফার্স্ট ক্লাস।'

কনক একটু গম্ভীর হয়ে পড়ল। জরীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোর খুব মায়াবী চেহারা জরী। রূপবতী হওয়া খুব বাজে ব্যাপার।'

'বাজে হলেও আমি রূপবতী হতে রাজি।'

সবাই হেসে উঠলেও কনক হাসল না। অসাধারণ সুন্দরী হয়ে জন্মানয় সে অনেক বার বাথরুমে দরজা বন্ধ করে কেঁদেছে। অনেক বার তার মনে হয়েছে, সাধারণ একটি বাঙালী মেয়ে হয়ে সে যদি জন্মাত। শ্যামলা রঙ, একটু বোকা-বোকা ধরনের মায়াবী চেহারা। কিন্তু তা হয় নি। পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টির নিচে অনেক যন্ত্রণার মধ্যে তাকে বড়ো হতে হয়েছে। অথচ ছোটবেলায় কেউ যখন বলত, কনকের মতো সুন্দর একটি মেয়ে দেখেছি আজ। তখন কী ভালোই না লাগত।

কুয়াশা কেটে রোদ উঠেছে। ধানী রঙের নরম রোদ। শিশিরভেজা মাটি থেকে আর্দ্র এক ধরনের গন্ধ আসছে। মেয়েদের দলটি গোল হয়ে বসে আছে শিউলিগাছের নিচে। এই গাছটি এক সময়ে প্রচুর ফুল ফোটাত। আজ তার আর সে-ক্ষমতা নেই। কয়েকটি সাদা সাদা ফুল পড়ে আছে। শীতের বাগানে যখন ধানী রঙের রোদ ওঠে এবং সেখানে যদি কয়েকটি মেয়ে চুপচাপ গোল হয়ে বসে থাকে, তাহলে বাগানের চেহারাই পাল্টে যায়। বড়োচাচা অবাক হয়ে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বিয়েবাড়ির লোকজন ক্রমে ক্রমে জেগে উঠছে। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের হুটোপুটি আর কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে। টিউবওয়েলে ঘটাং ঘটাং করে ক্রমাগত পানি তোলা হচ্ছে। ডেকোরেটরের দোকান থেকে লোকজন এসে গেটের জন্য মাপজোক শুরু করেছে। জরীর বাবা অকারণে একতলা থেকে দোতলায় ওঠানামা করছেন। মাঝে মাঝে তাঁর উঁচু গলা শোনা যাচ্ছে, 'এক ঘন্টা ধরে বলছি এক কাপ চা দিতে। শুধু এক কাপ চা, এতেই এত দেরি? মেয়ের বিয়ে কি আর কারো হয় না?'

আভা হঠাৎ বলল, 'জরী, তোর ছোটচাচার ছেলে কি আমেরিকা চলে গেছে?'

'না, সতের তারিখে যাবে।'

'একাই যাচ্ছে?'

'না। বড়োচাচা সঙ্গে যাবেন।'

কনক বলল , 'কী জন্যে যাচ্ছেন? কই, আমি তো কিছু জানি না?'

জরী অস্বস্তি বোধ করল। থেমে থেমে বলল, 'চিকিৎসা করাতে যাচ্ছে। মেরুদণ্ডে গুলী লেগেছিল। সেই থেকে পেরাপ্লেজিয়া হয়েছে। কোমরের নিচে থেকে অবশ।'

'আমাকে তো কিছু বলিস নি তুই, গুলী লাগল কী করে?'

'আর্মির লেফটেন্যান্ট ছিলেন। কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে যখন পাক-আর্মির সাথে যুদ্ধ হয়, তখন গুলী লেগেছে।'

লায়লা বলল, 'জরীর এই ভাইটিকে তো তুই চিনিস, কনক। মনে নেই--এক বার আমরা সবাই দল বেঁধে আনন্দমোহন কলেজে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম? তখন যে একটি ছেলে সন্ন্যাসী সেজেছিল, হঠাৎ নাটকের মাঝখানে তার দাড়ি খুলে পড়ে গেল। ঐ তো আনিস। যা মুখচোরা ছিল!'

জরী একটু হেসে বলল, 'ছোটবেলায় আনিস ভাই ভীষণ বোকা ছিল। একেক বার এমন হাসির কাণ্ড করত! তাকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে গেলেই হয়েছে, হয় সেখানে একটা কাপ ভাঙবে, নয় চেয়ার নিয়ে হঠাৎ গড়িয়ে পড়বে।'

রুনু বলল, 'বাঘের গল্পটা বল জরী, ওটা ভীষণ মজার।'

'না থাক।'

'বল না, শুনি।'

'এক বার আমরা সবাই "জঙ্গল বয়" ছবি দেখে এসেছি। আনিস ভাই ফিরে এসেই বড়চাচার সোয়েটার গায়ে দিয়ে বাঘ সেজেছে। আর আমরা সেজেছি হরিণ। আনিস ভাই হালুম শব্দ করে আমার ঘাড় কামড়ে ধরল। কিছুতেই ছাড়বে না। রক্তটক্ত বেরিয়ে সারা, শেষে বড়োচাচা এসে ছাড়িয়ে দিলেন। দেখ, এখনো দাগ আছে।'

জরীর মা দোতলা থেকে ডাকলেন, 'ও মেয়েরা, চা দেওয়া হয়েছে, এস শিগ্‌গির।' সবাই দেখল, তাঁর মুখ খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। এক জন সুখী চেহারার মা, যার খোঁপায় গোঁজা ফুলটি এখনো রয়েছে। হয়তো ফেলে দিতে তাঁর মনে নেই, কিংবা ইচ্ছা করেই ফেলেন নি।

আভা বলল, 'চা খেয়ে আমরা আনিস ভাইয়ের সঙ্গে একটু গল্প করব, কেমন জরী?'

'বেশ তো, করবি।'

'যুদ্ধের গল্প শুনতে আমার খুব ভালো লাগে।'

কনক বলল, 'কই, আর সানাইয়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না তো?'

সানাই বাজছিল ঠিকই, কিন্তু বিয়েবাড়ির হৈচৈ এত বেড়েছে যে শোনা যাচ্ছে না।

তারা সবাই দোতলায় উঠে এল। সিঁড়িতে জরীর বাবার সঙ্গে দেখা। তিনি দ্রুত নামছিলেন। জরীকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত গলায় বললেন, 'শুনেছিস কারবার, রশীদ টেলিফোন করেছে--দৈ নাকি পাওয়া যাবে না। জরী, তুই আমার সোয়েটারটা বের করে দে, আমি নিজেই যাই। তাড়াতাড়ি কর। এমন গাধার মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন--' বলে তাঁর খেয়াল হলে বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, 'আমি নিজেই খুঁজে নেব।' জরীর বন্ধুরা হাসতে লাগল।

সমস্ত শরীর মনে হচ্ছিল অবশ হয়ে যাচ্ছে। কোমরে কাছে চিনচিনে ব্যথা ক্রমশ

www.MurchOna.com

তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। সে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছল। ব্যথাটা শুরু হলেই ভীষণ ঘাম হয় ও পানির প্রবল তৃষ্ণা হয়। আজ টেবিলে পানির জগটি শূন্য। বিয়েবাড়ির ব্যস্ততার জন্যেই হয়তো রাত্রিতে পানি রেখে যেতে কারো মনে নেই। আনিস উল্টোদিকে এক শ' থেকে গুনতে শুরু করল। এক শ', নিরানব্বই, আটানব্বই—। কোনো একটা ব্যাপারে নিজেকে ব্যস্ত রাখা, যাতে ব্যথাটা ভুলে থাকা যায়।

ঘড়িতে সাড়ে ছ'টা বাজে। অন্য দিন এই সময়ে টিংকু এসে পড়ে। আজ আসে নি। বিয়েবাড়ির হৈচৈ ফেলে সে যে আসবে, এরকম মনে হয় না। তবু দরজার পাশে কোনো একটা শব্দ হতেই আনিস উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। না, টিংকু নয়। আবার তোয়ালে দিয়ে মুখের ঘাম মুছে আনিস কাৎরাতে থাকে। আশি, উনআশি, আটাত্তর, সাতাত্তর...। সাতটা বেজে গেছে। আজ তাহলে টিংকু আর এলই না।

অন্য দিন ভোর ছ'টার মধ্যে দরজায় ছোট ছোট হাতের থাবা পড়ত। চিনচিনে গলা শোনা যেত, 'আনিস, আনিস।'

'কী টিংকুমনি?'

'আমি এসেছি, দরজা খোল।'

আনিসের খাটটি এমনভাবে রাখা, যেন সে শুয়ে শুয়েই দরজার হুক নাগাল পায়। টিংকুর সাড়া পেলেই সে দরজা খুলে দিত। দেখা যেত ঘুম-ঘুম ফোলা মুখে চার বছরের একটি বাচ্চা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথাভর্তি লাল চুল। গায়ে কোনো ফ্রক নেই বলে শীতে কাঁপছে। দরজা খুলতেই সে গম্ভীর হয়ে বলবে, 'আনিস, তোমার ব্যথা কমেছে?'

'হ্যাঁ টিংকু।'

'আচ্ছা।'

তারপর সেই লাল চুলের মেয়েটি ঝাঁপিয়ে পড়বে বিছানায়। তার হৈচৈ-এর কোনো সীমা থাকবে না। একসময় বলবে, 'আমি হাতি-হাতি খেলব'। তখন কালো কম্বলটা তার গায়ে জড়িয়ে দিতে হবে। একটি কোলবালিশ ধরতে হবে তার নাকের সামনে এবং সে ঘনঘন হুঙ্কার দিতে থাকবে। আনিস বারবার বলবে, 'আমি ভয় পাচ্ছি, আমি ভয় পাচ্ছি'। এক সময় ক্লান্ত হয়ে কম্বল ফেলে বেরিয়ে আসবে সে। হাসিমুখে বলবে, 'আনিস, এখন সিগারেট খাও'। টিংকু নতুন দেয়াশলাই জ্বালাতে শিখেছে, সে সিগারেট ধরিয়ে দেবে। কিন্তু আজ দিনটি শুরু হয়েছে অন্যরকম ভাবে।

আজ টিংকু আসে নি। আনিস আবার ঘড়ি দেখল। সাড়ে সাতটা বাজে। অন্য দিন এ সময়ের মধ্যে তার দাড়ি কামান হয়ে যেত। বাসি জামা-কাপড় বদলে ফেলত। ভোরের প্রথম কাপ চা খাওয়াও শেষ হ'ত। আজ হয় নি। রাত থাকতেই যে অসহ্য ব্যথা শুরু হয়েছে দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে তা যেন ক্রমেই বাড়ছে।

www.MurchOna.com

পিপাসায় বুক-মুখ শুকিয়ে কাঠ।

খুট করে শব্দ হল দরজায়। আনিস চমকে উঠে বলল, 'কে, টিংকু নাকি? টিংকু?' কিন্তু টিংকু আসে নি, একটি অপরিচিত ছেলে উঁকি দিচ্ছে। আনিস কড়া গলায় ধমক দিল, 'গেট এওয়ে, গেট এওয়ে।'

ভয়ে ছেলেটির চোখে জল এসে গেল। তার পরনে স্ট্রাইপ-দেওয়া লাল ব্লেজারের শার্ট ও মাপে বড়ো একটি সাদা প্যান্ট। প্যান্ট বারবার খুলে পড়ছে, আর সে টেনে টেনে তুলছে।

আনিস ক্ষেপে গিয়ে বলল, 'যাও এখানে থেকে--যাও।'

ছেলেটি প্যান্ট ছেড়ে দিয়ে হাত দিয়ে চোখের জল মুছল। অনেক দূর নেমে গেল প্যান্ট। সে ভয় পাওয়া গলায় বলল, 'আমি হারিয়ে গেছি। আম্মাকে খুঁজে পাই না।'

'কী নাম তোমার?'

'বাবু।'

আনিস খাণিকক্ষণ তাকিয়ে রইল বাবুর দিকে। হঠাৎ গলার স্বর পাল্টে কোমল সুরে বলল, 'ভেতরে এস বাবু।'

বাবু সংকুচিত ভঙ্গিতে ভেতরে এসে ঢুকল। একটু ইতস্তত করে বলল, 'তুমি কাঁদছ কেন?'

'আমার অসুখ করেছে।'

'পেটে ব্যথা?'

'হুঁ। বস তুমি চেয়ারে। তোমার আম্মাকে খুঁজে দেব। তুমি কোথায় থাক?'

'বাসায় থাকি।'

'কী নাম তোমার?'

'বলেছি তো এক বার।'

'ও, তোমার নাম বাবু। বস একটু।'

আনিস তোয়ালে দিয়ে আবার কপালের ঘাম মুছল। ন'টা বেজে গেছে। রোদ এসেছে ঘরের ভেতরে। একটা ভ্যাপসা ধরনের গরম পড়েছে। বাসি-বিছানা থেকে এক ধরনের ভেজা গন্ধ আসছে। বাবু বসে আছে চুপচাপ, সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আনিসের দিকে।

'আনিস ভাই, ভিতরে আসব?'

দরজার ওপাশে জরীর বন্ধুরা কৌতূহলী চোখে উঁকি দিচ্ছে। এদের মধ্যে এক রুনুকেই আনিস চিনতে পারল।

আনিস বলল, 'জরী আসে নি?'

'না। সে একতলায় আটকা পড়েছে।'

জরীর গায়ে-হলুদের আয়োজন চলছে নিচে। পরীর জন্যে অপেক্ষা করতে

করতেই গায়ে–হলুদের অনুষ্ঠান পিছিয়ে গেল। পরীর আসবার সময় হয়েছে। তাকে আনতে স্টেশনে গাড়ি গিয়েছে।

চিত্রিত পিঁড়িতে বসে আছে জরী। কলসীতে করে পানি এনে রাখা হয়েছে। জরীর সামনে ডালায় বিচিত্র সব জিনিসপত্র সাজান। সেখানে আবার দু'টি প্রদীপ জ্বলছে। রাজ্যের মেয়েরা ভিড় করেছে সেখানে। বরের বাড়ি থেকে পাঠান গায়ে–হলুদের শাড়ি নিয়ে বেশ হৈচৈ হচ্ছে। কাজের বেটিরাও নাকি এত কমদামী শাড়ি পরে না––এ ধরনের কথা শোনা যাচ্ছে। রুনু এই ফাঁকে তার বন্ধুদের দোতলায় নিয়ে এসেছে। কনক তখন থেকেই আনিসের সঙ্গে দেখা করবার কথা বলছিল।

আনিস বলল, 'ভেতরে আস রুনু। কী ব্যাপার?'

'আনিস ভাই, এরা সবাই জরী আপার বন্ধু, তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছে।'

আনিস বিরক্তি চেপে কোনো মতে বলল, 'তোমরা বস।'

ঘরে বসবার কিছু নেই। একটিমাত্র চেয়ার, সেটিতে বাবু গম্ভীর হয়ে বসে আছে। আনিস কী বলবে ভেবে পেল না। বিব্রতভাবে বলল, 'হঠাৎ আমার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে হল কেন?'

কেউ সে কথার জবাব দিল না। রুনু কনককে দেখিয়ে বলল, 'এর নাম কনক, খুব নামকরা মেয়ে আনিস ভাই। রেডিওতে রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়। সে–ই আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বেশি ব্যস্ত।'

কনক চুপ করে রইল। আভা বলল, 'আপনি আমাদের যুদ্ধের গল্প বলুন, আনিস ভাই।'

আনিস থেমে থেমে বলল, 'আমি যুদ্ধের কোনো গল্প জানি না।'

'কেন, আপনি আর্মির সঙ্গে যুদ্ধ করেন নি?'

'করেছি।'

'সেই গল্প বলুন।'

'আমি যুদ্ধের গল্প বলি না।'

আভা মুখ কালো করে ফেলল। লায়লা বলল, 'চল, কনক। যাই, গায়ে–হলুদের সময় হয়ে গেছে।' কনক নড়ল না। থেমে থেমে বলল, 'যুদ্ধের সময় আমি বড়ো কষ্ট করেছি আনিস ভাই। বরিশালের কাছে এক জঙ্গলে আমি, আমার মা আর দুই খালা এক সপ্তাহ লুকিয়ে ছিলাম। এক খালা সেই জঙ্গলেই ভয় পেয়ে মারা গিয়েছিলেন।'

আনিস বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল কনকের দিকে। কনক গাঢ় স্বরে বলল, 'খুব কষ্ট করেছি বলেই যারা যুদ্ধ করেছে তাদের আমার সব সময় খুব আপন মনে হয়।'

www.MurchOna.com

কনকের কথার মাঝখানে আনিস হঠাৎ বলে উঠল, 'আমি খুব অসুস্থ। তোমার সঙ্গে পরে আলাপ করব। রুন্নু, এই ছেলেটিকে নিয়ে যা। সে তার মাকে খুঁজে পাচ্ছে না।'

বাবুকে রুন্নু কোলে তুলে নিতে গেল। বাবু চেয়ারে আরও ভালো করে সেঁটে বসল। আনিসের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'আমি যাব না। আমি এখানে থাকব।'

রুন্নু তাকে দু' হাত ধরে উপরে তুলতেই সে পা ছুঁড়ে কাঁদতে শুরু করল। রুন্নু বলল, 'আনিস ভাই, আমরা যাই?'

'আচ্ছা যাও। কিছু মনে করো না কনক।'

'না–না আনিস ভাই, আমি কিছু মনে করি নি।'

আনিস হাঁপাতে শুরু করল। অসহ্য! খুব ঘাম হচ্ছে। বুক শুকিয়ে কাঠ। দাঁতে দাঁত চেপে সে মনে মনে গুনল--এক শ', নিরানব্বই–। দরজায় টোকা পড়ল। আনিস তাকাল ঘোলা চোখে। বাবু আবার ফিরে এসেছে। আনিস চোখ বন্ধ করে ফেলল। বাবু বলল, 'আমি এসেছি।'

আনিস কোনো মতে বলল, 'বাবু, এক গ্লাস পানি আন।'

আনিসের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। পেথিড্রিন দিতে হবে নাকি কে জানে। বড়োচাচাকে খবর দেওয়া প্রয়োজন।

বাবু প্যানির খোঁজে বেরিয়ে একা একা ঘুরে বেড়াতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল ছাদে। সেখানে মিস্তিরিরা সামিয়ানা খাটাচ্ছে। সে অনেকক্ষণ তাই দেখল। তারপর নেমে এল দোতলায়। দোতলা খাঁ–খাঁ করছে। সবাই গিয়েছে গায়ে–হলুদে। সে এ–ঘর থেকে ও–ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

জরীর বড়োচাচা তাঁর রেডিওগ্রাম বন্ধ করে দিয়ে বিরক্ত হয়ে বারান্দায় বসে ছিলেন। বাবু তাকে গিয়ে বলল, 'পানি খাব।' তিনি তাকে পানি খাইয়ে দিলেন। বাবু শান্ত হয়ে আনিসের ঘর খুঁজে বেড়াতে লাগল।

পরীর ট্রেন ভোর সাড়ে আটটার মধ্যে ময়মনসিংহ পৌছানর কথা। কিন্তু গফরগাঁ আসতেই পৌনে ন'টা হয়ে গেল। মেল ট্রেন, অথচ ছোট–বড়ো সব স্টেশন ধরছে। লোক উঠেছে বিস্তর। ছাদে পর্যন্ত গাদাগাদি ভিড়। ফার্স্ট ক্লাস কামরাগুলি অপেক্ষাকৃত ফাঁকা ছিল। কিন্তু কাওরাইদে এক দঙ্গল ছাত্র উঠে পড়ল। বিপদের ওপর বিপদ। পরীর মেয়ে লীনা ক'দিন ধরেই সর্দিতে ভুগছিল। ট্রেনে ওঠার পর থেকে তার জ্বর হু–হু করে বাড়তে লাগল। পরী মেয়েকে কোলে করে জানালার এক পাশে বসেছে, তার অন্য পাশে বসেছে পান্না। পান্না এক দণ্ডও কথা না বলে থাকতে পারে না। সে ক্রমাগত মাকে প্রশ্ন করে যাচ্ছে ঃ 'এটা কী মা?' 'ঐ লোকগুলি নৌকায় কী করছে মা?' 'ঐ নৌকাটার পাল লাল, আর এইটার সাদা

www.MurchOna.com

কেন মা?'

হোসেন সাহেব ট্রেনে উঠেই একটা বই তাঁর নাকের সামনে ধরে রেখেছেন। গাড়ির ভিড়, লীনার জ্বর বা পান্নার প্রশ্নমালা কিছুই তাঁকে বিচলিত করতে পারছে না। পরীর বিরক্তি ক্রমেই বাড়ছিল। এক সময় সে ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'রাখ তোমার বই। দেখ মেয়েটার কেমন জ্বর।'

হোসেন সাহেব হাত বাড়িয়ে মেয়ের উত্তাপ দেখলেন। শান্ত গলায় বললেন, 'ও কিছু নয়। এক্ষুণি রেমিশন হবে।'

তিনি বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগলেন। পান্না বলল, 'মা, রেমিশন কী?'

'কি জানি কী। চুপ করে বসে থাক।'

গাড়ির অনেকেই কৌতূহলী হয়ে তাকাচ্ছে পরীর দিকে। পরী সেই ধরনের মহিলা, যাদের দিকে পুরুষেরা সব সময় কৌতূহলী হয়ে তাকায়। চোখে চোখ পড়লেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় না।

রূপবতী মেয়েদের প্রায়ই বড়ো রকমের কোনো ত্রুটি থাকে। পরীর একটিমাত্র ত্রুটি--সে বোকা। হোসেন সাহেব পরীকে বিয়ে করে বেশ হতাশ হয়েছেন। শুধুমাত্র রূপ একটি পুরুষকে দীর্ঘদিন মুগ্ধ করে রাখতে পারে না। পরীর মেয়ে দু'টি মায়ের মতো রূপবতী হয় নি দেখে হোসেন সাহেব খুশি হয়েছেন। মেয়ে দু'টি বাবার গায়ের শ্যামলা রঙ পেয়েছে। চোখ মুখ নাক ফোলা ফোলা। অনেকখানি মিল আছে চাইনিজ বাচ্চাদের সঙ্গে। এবারডীন হসপিটালের এক নার্স হোসেন সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'বাচ্চাদের মা কি চাইনিজ?' পরী তার মেয়ে দু'টিকে নিয়ে মাঝে মাঝে দুশ্চিন্তায় ভোগে। বড়ো হলে বিয়ে দিতে ঝামেলা হবে--এই সব ভাবনা তাকে মাঝেমধ্যেই পায়। হোসেন সাহেবকে সে-কথা বলতেই তিনি হো হো করে হাসতে থাকেন। পরী রাগী গলায় বলে, 'এর মধ্যে হাসির কী হল? কালো মেয়েদের কি ভালো বিয়ে হয়? আমি যদি কালো হতাম তুমি আমাকে বিয়ে করতে?' হোসেন সাহেব একটু অপ্রস্তুত হন। মাঝেমধ্যে পরী বেশ গুছিয়ে কথা বলে। হোসেন সাহেব বলেন, 'আমার সঙ্গে তোমার বিয়েটা তাহলে খুব ভালো বিয়ে বলতে চাও?'

পরী তার জবাব দেয় না। কারণ মাঝে মাঝে তার নিজেরই সন্দেহ হয়। যদিও হোসেন সাহেব একটি নিখুঁত ভদ্রলোক এবং তাঁকে বিয়ে করবার ফলেই সে পৃথিবীর অনেকগুলি বড়ো বড়ো দেশ ঘুরে বেড়িয়েছে, তবু কোথাও কিছু অমিল আছে। লণ্ডনে থাকাকালীন প্রথম এটি পরীর চোখে পড়ে। পরীকে সারা দিন একা একা থাকতে হ'ত ফ্ল্যাটে। রেকর্ড বাজিয়ে আর রান্না করে কতটুকু সময়ই-বা কাটে! গল্প করার লোক নেই। পরী ইংরেজি জানলেও বলতে পারে না। আবার বিদেশী উচ্চারণ বুঝতেও পারে না। তার সারাটা দিন কাটত কয়েদীর মতো। হোসেন সাহেব ফিরতেন সন্ধ্যাবেলায়। চা খেয়েই তাঁর পড়াশোনা শুরু হ'ত। পরী

www.murchona.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

হয়তো একটা গল্প শুরু করেছে। হোসেন সাহেব হাসিমুখে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। কিন্তু কিছু দূর বলবার পরই পরী বুঝতে পারত, হোসেনের গল্প শোনার মুড নেই। সে তাকিয়ে আছে পরীর দিকে ঠিকই, কিন্তু ভাবছে অন্য কিছু। পরী আচমকা গল্প বন্ধ করত। হোসেন সাহেব বলতেন, 'তারপর কী হল?'

'থাক। আর ভালো লাগছে না--' এই বলে গম্ভীর হয়ে উঠে যেত পরী। তার আরো খারাপ লাগত, যখন দেখত হোসেন গল্প বন্ধ হওয়ায় খুশিই হয়েছে।

পরী বলল, 'ময়মনসিংহ আর কত দূর?'

হোসেন সাহেব বই থেকে চোখ তুলে বললেন, 'দূর আছে।'

পরী বলল, 'বাই রোডে এলে কত ভালো হত।'

হোসেন সাহেব জবাব দিলেন না। পান্না বলল, "বাই রোডে এলে ভালো হত কেন মা?'

'আর একটা কথা বললে চড় খাবি পান্না।'

পরী ঝাঁঝিয়ে উঠল। পান্না উশখুশ করতে লাগল। আরেকটা কথা জানবার জন্যে তার খুব ইচ্ছে হচ্ছে। সে কয়েক বার মা'র দিকে তাকাল। মা ভীষণ গম্ভীর। কাজেই সে ঝুঁকে এল বাবার কাছে। ফিসফিস করে কানে কানে বলল, 'বাবা, একটা কথা শোন।'

'বল।'

'ঐ যে কারেন্টের তারে পাখি বসে আছে দেখেছ?'

'হুঁ দেখলাম, শালিক পাখি।'

'ঐ পাখিগুলি শক খায় না কেন?'

'টেলিগ্রাফের তারে বসে আছে। টেলিগ্রাফের তারে কারেন্ট নেই, তাই শক খায় না।'

'অ বুঝেছি।'

পরী দেখল, মেয়ে ও বাবা খুব আলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। সে আগেও দেখেছে, মেয়ের সঙ্গে আলাপে হোসেনের কোনো ক্লান্তি নেই। তখন আর্জেন্ট কলের কথাও মনে থাকে না। জরুরী টেলিফোন করতে হবে বলে হঠাৎ উঠে পড়ারও প্রয়োজন হয় না। পরীর মনে হল সে দারুণ অসুখী ও দুঃখী। এ রকম মনোভাব তার প্রায়ই হয়। সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল।

বিলেতে থাকার সময়ও পরী লক্ষ করেছে তার ব্যাপারে হোসেনের কোনো আগ্রহ নেই। প্রায়ই একগাদা চিঠি আসত পরীর। হোসেন সাহেব ভুলেও জিজ্ঞেস করতেন না চিঠি কে লিখল। সে-সব চিঠির জবাব লিখতে একেক সময় গভীর রাত হয়ে যেত। ঘড়ির কাঁটার নিয়মে ঘুমুতে যেতেন হোসেন সাহেব, ভুলেও জিজ্ঞেস করতেন না এত রাত জেগে কোথায় চিঠি লেখা হচ্ছে।

হোসেনের এক বন্ধু প্রায়ই আসত বাসায়। সে পরীর সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা

www.MurchOna.com

আলাপ করত। পরী কোনো কোনো দিন ইচ্ছে করেই সেই বন্ধুটির সঙ্গে বেড়াতে যেত। ফিরতে রাত হ'ত প্রায় সময়ই। পরী চাইত, হোসেনের মনে একটু সন্দেহ দেখা দিক। ঈর্ষার কিছু জীবাণু কিলবিল করে উঠুক তাঁর মনে। কিন্তু সে-রকম কিছুই হয় নি। হোসেন নির্বিকার ও নিরাসক্ত। হাল ছেড়ে দিয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিল পরী। লীনা-পান্না এল সংসারে। যমজ মেয়ে একা সামলান মুশকিল। রাত জাগা, কাপড় বদলে দেওয়া, ঘড়ি দেখে দেখে দুধ বানান--এ সব করতে করতে এক সময় পরীর মনে হল সংসারটা এমন কিছু খারাপ জায়গা নয়। হোসেনের মতো স্বামী নিয়ে সুখী হতে বাধা নেই।

কিন্তু হোসেন যদি আরো একটু কাছে আসত। পরীর কত কী আছে গল্প করবার। সে-সব যদি সে মন দিয়ে শুনত। কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে যদি না বলত--পরী, আজ বড়ো ঘুম পাচ্ছে, তাহলে জীবনটা অনেক বেশি অর্থবহ ও সুরভিত হ'ত না?

ময়মনসিংহ এসে গেল প্রায়। এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি স্টেশনে গাড়ি এসে থেমেছে। ছাত্রদের দলটি নেমে যাওয়াতে কামরাটি একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। হোসেন সাহেব বই বন্ধ করে জানালা দিয়ে গলা বের করলেন। চমৎকার ইউনিভার্সিটি। সবুজে সবুজে ছয়লাপ। সাদা রঙের বড়ো বড়ো দালানগুলিকে দ্বীপের মতো লাগছে। রাস্তার দু'পাশে নারকেল গাছের সারি। পরী বলল, 'লীনার জ্বর আর নেই। দেখ তো ক'টা বাজে।'

'দশটা পনের। আড়াই ঘন্টা লেট।'

পান্না বলল, 'আড়াই ঘন্টা লেট হলে কী হয় বাবা?'

'খুব মজা হয়। জুতো পরে নাও পান্না, আর দেরি নেই।'

লীনাকে শুইয়ে রেখে পরী টয়লেটে গিয়ে চুল আঁচড়াল। পান্নার জুতো পরিয়ে দিল। লীনার ঘুম ভাঙিয়ে, তার জামা বদলে দিল। বেশ লাগছে তার। পরী হালকা গলায় বলল, 'জরীর গায়ে-হলুদ কি হয়ে গেল?'

'তোমার জন্যে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করবে।'

পরী হাসিমুখে বলল, 'বউ সাজলে জরীকে কেমন দেখাবে কে জানে?'

হোসেন সাহেব জবাব দিলেন না। তিনি খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন।

দূর থেকে স্টেশনের লাল দালান দেখা যাচ্ছে। লাইন বদল হওয়ার ঘটাং ঘটাং শব্দ আসছে। হোসেন সাহেব হঠাৎ বললেন, 'পরী, আনিসের চিঠির কথাটা মনে আছে? বড়ো কষ্ট লাগছে।'

পরী বলল, 'আনিস বাঁচবে তো?'

'না। স্পাইনাল কর্ডের লম্বোসেকরেল রিজিওন ডেমেইজড। তাছাড়া শুধু পেরাপ্লেজিয়া নয়, আরো সব জটিলতা দেখা দিয়েছে। শুনেছি পেথিড্রিন দিতে হয়।'

পরী গম্ভীর হয়ে পড়ল। হোসেন সাহেব বললেন, 'কাল রাত থেকে আনিসের

www.MurchOna.com

চিঠির কথা মনে পড়ছে। তোমার কাছে আছে সেটা।'

'না নেই।'

চিঠিটি আনিস পরীকে অনেক ভণিতা করে লিখেছিল। পাঁচ বৎসরে আনিস মাত্র চারটি চিঠি লিখেছিল। ছয়-সাত লাইনের দায়সারা গোছের চিঠি। কিন্তু শেষ চিঠিটি ছিল সুদীর্ঘ। চিঠিতে অনেক কায়দা-কানুন করে লিখেছে সে জরীকে বিয়ে করতে চায়। কাউকে বলতে লজ্জা পাচ্ছে। তবে জরীর কোনো আপত্তি নেই। এখন একমাত্র ভরসা পরী, পরী যদি দয়া করে কিছু একটা করে তাহলে সারা জীবন সে--ইত্যাদি ইত্যাদি।

পরী এ চিঠি পেয়ে হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পায় নি। সে জোর গলায় বলেছে, 'জরী কিছুতেই রাজি হবে না। ভাইবোনের মতো মানুষ হয়েছি। ছোটবেলায় সবাই এক খাটে ঘুমাতাম।'

কিন্তু হোসেন সাহেব খুব শান্ত গলায় বলেছেন, 'খুব রাজি হবে। আনিসের মতো ছেলে হয় না। তুমি লেখ শ্বশুর সাহেবকে। আমিও লিখব।'

আনিসের চিঠি পড়ে হোসেন সাহেবের বুঝতে একটুও অসুবিধে হয় নি যে, চিঠিটা আসলে লিখেছে জরী। আনিস শুধু কপি করেছে। চিঠিতে পাঁচবার 'আশ্চর্য' শব্দটি আছে। ঘন ঘন আশ্চর্য ব্যবহার করা জরীর পুরনো অভ্যাস। তার সব চিঠি শুরু হয় এইভাবে, 'আশ্চর্য, বহু দিন আপনাদের চিঠি পাই না।'

আনিস খুবই ভালো ছেলে এতে সন্দেহের কোনো কারণ নেই। তবু পরী জানত বাবা রাজি হবেন না। তিনি কোনো একটি বিচিত্র কারণে আনিসকে সহ্য করতে পারতেন না। তাছাড়া আনিসের মা বিধবা হবার পরপরই আরেকটি ছেলেকে বিয়ে করে খুলনা চলে যান। এই নিয়েও অনেক কথা ওঠে। সব জেনেশুনে পরীর বাবা আনিসকে পাত্র হিসেবে পছন্দ করবেন কেন? তাছাড়া এত ঘনিষ্ঠভাবে চেনা একটি ছেলেকে কি বিয়ে করা উচিত? পরী খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল।

এর পরপরই স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হল। পরীকে চিঠি লিখতে আর হল না। সে যখন দেশে ফিরে এল, তখন আনিস কম্বাইন্ড মিলিটারি হসপিটালে। সেখান থেকে পি জি-তে।

জরী আনিসকে দেখে খুব কেঁদেছিল। আনিস সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বলেছে, 'একটা যুদ্ধে অনেক কিছু হয়, জরী।' কত বার জরী গিয়েছে হাসপাতালে, কত কথাই তো হয়েছে, কিন্তু ভুলেও আনিস সেই চিঠির উল্লেখ করে নি। জরীও সে-প্রসঙ্গ তোলে নি। যেন তাদের মনেই নেই, তারা দু' জনে মিলে চমৎকার একটি চিঠি লিখেছিল পরীকে।

গাড়ি ইন্ করেছে স্টেশনে। হোসেন সাহেব বললেন, 'লীনাকে আমার কোলে দিয়ে তুমি নাম পরী।'

পরীকে দেখতে পেয়ে একদল ছেলেমেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'ইস এত দেরি,

www.MurchOna.com

এদিকে বোধ হয় গায়ে-হলুদ হয়ে গেছে।'

পরী তাদের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল।

লীনা হাততালি দিল।

বিয়েবাড়ি খুব জমে উঠেছে।

বাড়ির সামনে খোলা মাঠে ছেলেমেয়েরা হৈহৈ করে চি-বুড়ি খেলছে। তাদের চিৎকারে কান পাতা দায়। শিশুদের আরেকটি দল গম্ভীর হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেখানে বাবুর্চিরা রান্না বসিয়েছে, সেখানেও অপেক্ষাকৃত কমবয়সী শিশুদের জটলা। ছাদে সামিয়ানা খাটান হয়ে গেছে। সেখানে চেয়ার-টেবিল সাজান হয়েছে। অনেকেই ভারিক্কি চালে চেয়ারে বসে আছে।

কিশোরী মেয়েদের ছ'-সাত জনের একটি দল জোট বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিয়ে উপলক্ষে তারা আজ সবাই শাড়ি পরেছে। সবাই আপ্রাণ চেষ্টা করছে যেন তাদেরকে মহিলার মতো দেখায়। এদের মধ্যে শীলা নামের একটি মেয়ে বাড়ি থেকে এক প্যাকেট দামী সিগারেট এনেছে। বিয়েবাড়ির একটি নির্জন আড়াল খুঁজে পেলেই সিগারেট টানা যায়। কিন্তু কোথাও সে-রকম জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। কিশোরীর এই দলটির সবাই কিছু পরিমাণে উত্তেজিত। তারা কথা বলছে ধীরে ধীরে। মাঝে মাঝেই হেসে উঠছে, তবে সে-হাসির স্বরগ্রামও খুব নিচু।

শেষ পর্যন্ত তারা একটি জায়গা খুঁজে পেল। দোতলায় সবচেয়ে দক্ষিণের একটি ঘর। পুরনো আসবাবে সে-ঘরটি ঠাসা। দু'টি জানালাই বন্ধ বলে ঘরের ভেতরটা আর্দ্র ও অন্ধকার। একটি নিষিদ্ধ কিছু করবার উত্তেজনায় সবাই চুপচাপ।

বড়ো রকমের একটি ঝগড়াও শুরু হয়েছে বিয়েবাড়িতে। এসব ঝগড়াগুলি সাধারণত শুরু করেন নিমন্ত্রিত গরিব আত্মীয়রা। তাঁরা প্রথমে খুব উৎসাহ নিয়ে বিয়েবাড়িতে আসেন, কোনো একটা কাজ করবার জন্যে ঘুরে বেড়ান। কিন্তু কিছু করতে না পেরে ক্রমেই বিমর্ষ হয়ে ওঠেন। একসময় দেখা যায় একটি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তাঁরা মেতে উঠেছেন। চিৎকারে কান পাতা যাচ্ছে না। বরপক্ষীয়দের তরফ থেকে দু'টি রুই মাছ পাঠান হয়েছিল, মাছ দু'টি নাকি পচা---এই হচ্ছে আজকের ঝগড়ার বিষয়।

তবে সব বিয়েতেই চরম গণ্ডগোলগুলি যেমন ফস করে নিভে যায়, এখানেও তাই হল। দেখা গেল বরপক্ষীয় যারা বিয়ের তত্ত্ব নিয়ে এসেছিল (দু'টি মেয়ে, একটি অল্পবয়সী ছেলে এবং এক জন মাঝবয়সী ভদ্রলোক), মহানন্দে রঙ-খেলায় মেতে গেছে। বরের বাড়ির রোগামতো লম্বা মেয়েটিকে দু'-তিন জনে জাপটে ধরে সারা গায়ে খুব করে কালো রঙ মাখাচ্ছে। মেয়েটি হাত-পা ছুঁড়ছে এবং খুব হাসছে।

রঙ ছোঁড়াছুঁড়ির ব্যাপারটা দেখতে দেখতে ক্ষ্যাপামির মতো শুরু হল। একদল

www.MurchOna.com

মেয়ে দৌড়াচ্ছে, তাদের পিছু পিছু আরেক দল যাচ্ছে রঙের কৌটো নিয়ে। খিলখিল হাসি, চিৎকার আর ছোটাছুটিতে চারিদিক সরগরম। ছেলেদের দলও বেমালুম জুটে গিয়েছে। অল্পপরিচিত, অপরিচিত মেয়েদের গালে রঙ মাখিয়ে দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করছে না। মেয়েরাও যে এ ব্যাপারে কিছু একটা মনে করছে, তা মনে হচ্ছে না। তাদেরও ভালোই লাগছে।

পরী যখন এসে পৌঁছল, তখন বরের বাড়ির রোগা মেয়েটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে--যাকে দেখাচ্ছে ভূতের মতো। পান্না ভয় পেয়ে বলল, 'মা, একটা পাগলী, ওমা, একটা পাগলী।'

পরীকে দেখতে পেয়ে সবাই ছুটে এল। নিমেষের মধ্যে পরীর ধবধবে গাল আর লালচে ঠোঁট কালো রঙে ডুবে গেল। লীনা ও পান্না দু' জনেই হতভম্ব। লীনা বলল, 'এরকম করছে কেন?'

হোসেন সাহেব ব্যাপার দেখে সটকে পড়েছেন। সটান চলে গিয়েছেন দোতলায়।

লীনা ও পান্না হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ততক্ষণে রঙ-খেলা চরমে উঠেছে। ভেতরের বাড়ির উঠোনে বালতি বালতি পানি ঢেলে ঘন কাদা করা হয়েছে। মাঝ-বয়েসী একটি ভদ্রমহিলাকে সবাই মিলে গড়াগড়ি খাওয়াচ্ছে সেই কাদায়। ভদ্রমহিলার শাড়ি জড়িয়ে গেছে, ব্লাউজের বোতাম গিয়েছে খুলে। তিনি ক্রমাগত গাল দিচ্ছেন। কিন্তু সেদিকে কেউ কান দিচ্ছে না। সবাই হাসছে, সবাই চেঁচাচ্ছে। লীনা ও পান্নার বিমর্ষ ভাব কেটে গিয়েছে। তারাও মহানন্দে জুটে পড়েছে সে-খেলায়। পান্না স্ফূর্তিতে ঘন ঘন চেঁচাচ্ছে। এমন মজার ব্যাপার সে বহু দিন দেখে নি।

জরী এসে দাঁড়িয়েছে বারান্দায়। সে সবার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। তার একটু লজ্জা-লজ্জা করছে। পরী কাদামাখা শরীরে জরীকে জড়িয়ে ধরল। জরী বলল, 'আপা, কখন এসেছিস?'

'এই তো এখন। তোর কেমন লাগছে জরী?'

'কী কেমন লাগছে?'

'বিয়ে।'

জরী হাসতে লাগল।

রঙ ছোঁড়াছুঁড়ির হাত থেকে বাঁচবার জন্য হোসনে সাহেব অতিরিক্ত ব্যস্ততায় দোতলায় উঠে এসেছেন। তাঁর গায়ে শার্ক-স্কিনের দামী কোট--নষ্ট হলেই গেল। বিয়েটিয়ের সময় মেয়েদের কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। উঠোনের কাদায় গড়াগড়ি করাতেও তাদের বাধবে না।

দোতলায় তিনি আনিসের ঘরটি খুঁজে পেলেন না। হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলেন শেষ প্রান্তে। সেখানে কিশোরী মেয়েদের দলটি সিগারেট টানছে। তারা হোসেন

www.MurchOna.com

সাহেবকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। তিনি নিজেও বিস্মিত, তবু হাসি হাসি মুখে বললেন, 'আনিসের ঘরটা এক জন দেখিয়ে দাও তো।'

কেউ নড়ল না।

আনিসের ব্যথা এখন একেবারেই নেই। শরীর বেশ হালকা ও ঝরঝরে লাগছে। জমাদার এসেছিল ঘর ঝাঁট দিতে, বেডপ্যান সরিয়ে নিতে, তাকে দিয়ে পানি আনিয়ে আনিস দাড়ি কামাল। মুখ ধোওয়া, চুল ব্রাশ করা আগেই হয়েছে। হালকা গোলাপী একটা সিল্কের শার্ট বের করে পরল। বিয়েবাড়ি উপলক্ষে কত লোকজন আসে, এ সময় কি বাসি কাপড়ে ভূত সেজে শুয়ে থাকা যায়? বেশ লাগছে আনিসের। মাঝে মাঝে এরকম চমৎকার সময় আসে। মনে হয় বেঁচে থাকাটা খুব একটা মন্দ ব্যাপার নয়।

খবরের কাগজ দিয়ে গেছে খানিক আগে। আনিস আধশোওয়া হয়ে বসে আছে খবরের কাগজ কোলে নিয়ে। খবরের কাগজ কোলে নিয়ে বসে থাকাটাও রোমাঞ্চকর ব্যাপার। আনকোরা নতুন কাগজ। এখনো ভাঁজ ভাঙা হয় নি। ইচ্ছা করলেই পড়া শুরু করা যায়। তবে আনিস এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। তার পড়া শুরু হয় ভেতরের পাতা থেকে। হারান–বিজ্ঞপ্তি, পড়াইতে চাই, রেকর্ড–প্লেয়ার বিক্রি, পাত্রী চাই––এইগুলিই তার কাছে বড়ো খবর। পড়তে আনিসের দারুণ ভালো লাগে। এ থেকেই কত মজার মজার জিনিস চোখে পড়ে। একবার রইসুদ্দিন নামের এক ভদ্রলোক বিজ্ঞাপন দিল, 'আকবর ফিরিয়া আস, যাহা চাও, তাহাই হইবে। তোমার মা রোজ প্যানপ্যান করেন।' রোজ প্যানপ্যান করে শব্দটি আনিসের খুব মনে ধরেছিল এবং সে রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়েছিল, আকবর তার মায়ের কাছে ফিরেছে কিনা তাই ভেবে। আরেক বার আরেকটি বিজ্ঞাপন ছাপা হল––রোকেয়া সুলতানা নামের এক স্কুল–শিক্ষিকার। বর্ণনার ভঙ্গিটি ছিল এই রকম––'আমার বয়স পঁয়ত্রিশ। অবিবাহিতা। নিকট–আত্মীয়স্বজন কেউ বেঁচে নেই। কোনো সহৃদয় ছেলে আমাকে বিয়ে করলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। আমার চেহারা ভালো নয়।' শেষ লাইনের 'আমার চেহারা ভালো নয়' বাক্যটি একেবারে বুকে বেঁধে। ভদ্রমহিলাকে একটি চিঠি লিখবার দারুণ ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু কী লিখবে ভেবে পায় নি বলে লেখা হয় নি।

'আনিস, কী খবর?'

আনিস তাকিয়ে দেখল, হোসেন সাহেব হাসিমুখে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। এই লোকটিকে আনিস খুব পছন্দ করে। দেখা–সাক্ষাৎ তেমন হয় না, কিন্তু যখনি হয়, আনিসের সময়টা চমৎকার কাটে। হোসেন সাহেব বললেন, 'বাইরে খুব রঙ খেলা হচ্ছে, তোমার এখানে আশ্রয় নিতে এলাম।'

'খুব ভালো করেছেন। কখন এসেছেন?'

'এইমাত্র, কেমন আছ বল?'

www.MurchOna.com

'খুব ভালো।'

'তবে যে শুনলাম খুব পেইন হয়। মাঝে মাঝে পেথিড্রিন দিতে হয়।'

'তা হয়। কিন্তু এখন ভালো।'

হোসেন সাহেব কোট খুলে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে দিলেন। চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, 'তোমার জন্যে গল্পের বই পাঠিয়েছিলাম, পেয়েছ?'

'জ্বি, পেয়েছি।'

'পড়েছ নাকি সব?'

'কিছু কিছু পড়েছি।'

'কী–যে রস পাও গল্পের বইয়ে, তোমরাই জান। তোমার পরী আপার তো বই পেলে আর কথা নেই। এক বার কী–একটা বই পড়ে ফিচফিচ করে এমন কান্না––দুপুরে ভাত খেল না, রাতেও না।'

'কী বই সেটি?'

'কি জানি কী বই। জিজ্ঞেস করো ওকে। যে–লেখক লিখেছে, সে নিশ্চয়ই লিখবার সময় খাওয়াদাওয়া ঠিকঠাক করেছে।'

হোসেন সাহেব হাসতে লাগলেন। আনিসও হাসল। হোসেন সাহেব বললেন, 'এক কাপ চা খেলে হ'ত।'

'আমার এখানে চায়ের সরঞ্জাম আছে। কাউকে ডেকে আনেন।'

'ডাকতে হবে না, আমিই পারব।'

হোসেন সাহেব নিঃশব্দে উঠে গিয়ে হিটার জ্বালালেন। চা, চিনির পট খুঁজে বের করলেন। দু'টি কাপ ধুয়ে টেবিলে এনে রাখলেন। আনিস দেখল, তিনি মৃদু মৃদু হাসছেন। এই লোকটির বেশ কিছু বিচিত্র অভ্যেস আছে। আপন মনে হাসা, আপন মনে কথা–বলা তার মধ্যে পড়ে। এছাড়াও আরো অদ্ভুত অভ্যেস আছে। যেগুলি পরী জানে। কিন্তু পরী সে–সব নিয়ে কারো সঙ্গে গল্প করতে পারে না। তার স্বামী সম্পর্কে সে খুব সজাগ। কেউ তার কোনো দোষ ধরুক, তাকে নিয়ে হাসি–তামাশা করুক, এসব সহ্য করতে পারে না। বড়োচাচা একবার পরীকে বলেছিলেন, 'তোর ভদ্রলোকটি এমন মিনমিনে কেন রে?' এতেই পরী কেঁদেকেটে অস্থির হয়েছিল। বড়োচাচা অপ্রস্তুতের একশেষ। আবার এও ঠিক, হোসেন সাহেবের সঙ্গে পরীর বনিবনা হয় নি। কুমারী অবস্থায় পরী যে–সব কথা ভেবে একা একা লাল হ'ত তার কোনোটিই বাস্তবের সঙ্গে মেলে নি। এ নিয়ে তার গোপন ব্যথা আছে। আনিস তা জানে। সে হঠাৎ বলল, 'পরী তার বাচ্চা দু'টিকে কেমন আদর করে দুলাভাই?'

'খুব, যাকে বলে এনিমেল লাভ।'

'আর আপনাকে?'

'আমাকে ভয় করে। নাও তোমার চা। মিষ্টি লাগবে কিনা বল।'

www.MurchOna.com

আনিস চায়ে চুমুক দিল। পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠছে। সকালে নাশতা খায়নি, এখন বেলা হয়েছে বারটা। খিদে জানান দিচ্ছে। হোসেন সাহেব বললেন, 'এ রকম করছ কেন? ব্যথা শুরু হল নাকি?'

'না, ও কিছু নয়।'

হোসেন সাহেব সিগারেট ধরালেন। আনিস খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'আপনি কি সুখী?'

'সামটাইমস। একটি মানুষ সারাক্ষণ সুখী থাকতে পারে না। মাঝে মাঝে সুখী হয়। এখন আমি সুখী।'

'কেন?'

'কি জানি কেন। হঠাৎ এসব কথা জিজ্ঞেস করছ যে?'

'দুলাভাই, মাঝে মাঝে আমি এসব নিয়ে ভাবি। কিচ্ছু করবার নেই তো, এই জন্যে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় আসলে হ্যাপিনেস বলে আলাদা কিছু নেই।'

আনিসের কথা শেষ হবার আগেই দারুণ হৈচৈ ও চেঁচামেচি শোনা যেতে লাগল। একটি তীক্ষ্ণ মেয়েলী গলায় কে যেন কেঁদে উঠল। ছাদের উপর থেকে হুড়মুড় শব্দ করে একসঙ্গে অনেক লোক নিচে নেমে এল। হোসেন সাহেব আধ-খাওয়া চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

গোলমালটা যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ থেমে গেল। একটি বিয়েবাড়ির হৈচৈ হঠাৎ থেমে গেলে বুকে ধক করে ধাক্কা লাগে। আনিস নিদারুণ অস্বস্তি নিয়ে অপেক্ষা করছিল।-----হোসেন সাহেবের ফিরে আসতে দেরি হল না। তিনি আবার তাঁর ঠাণ্ডা চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। আনিসের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হাসলেন। আনিস বলল, 'কী হয়েছিল দুলাভাই?'

'আমার মেয়ে পান্না ডুবে গিয়েছিল পুকুরে।'

'বলেন কী!'

'সঙ্গে সঙ্গে তুলে ফেলেছে।'

'পুকুরে গেল কী করে?'

'মেয়েরা সবাই রঙ খেলে গিয়েছিল গা ধুতে, পান্নাও গিয়েছে।'

হোসেন সাহেব আরেকটি সিগারেট ধরালেন। আনিস দেখল আগুন জ্বালাতে গিয়ে তাঁর হাত কাঁপছে, দেশলাইয়ের কাঠি বারবার নিভে যাচ্ছে। আনিস বলল, 'আপনি পরীর কাছে যান।'

'যাই। সিগারেটটা শেষ করে নিই। পরী কী করছে জান? লীনা-পান্না, তার দু' বাচ্চাকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। মাঝে মাঝে অবিকল গরুর মতো গলায় চিৎকার করে কাঁদছে।'

'দুলাভাই, আপনি পরীর কাছে যান।'

'যাই। আনিস, তুমি হ্যাপিনেস সম্পর্কে জানতে চাইছিলে---'

www.MurchOna.com

'পরে বলবেন। এখন পরীর কাছে যান।'

'হ্যাঁ, তাই যাই।'

হোসেন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। আনিস দেখল, তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তিনি অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হাসলেন।

হৈচৈ শুনে বড়োচাচা নিচে নেমে গিয়েছিলেন।

ততক্ষণে পান্নাকে পানি থেকে তোলা হয়েছে এবং পান্নার চার পাশে একটি জটলার সৃষ্টি হয়েছে। সব ক'টি বাচ্চা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। বড়োচাচা কয়েক বার জানতে চেষ্টা করলেন কী হয়েছে। কিন্তু সবাই হৈচৈ করছে, কেউ কিছু বলছে না। তিনি ভিড়ের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখলেন পরী তার দুই মেয়েকে জড়িয়ে ধরে ঠকঠক করে কাঁপছে। পরীর গা ভেজা, তার মাথায় কচুরিপানার ছোট ছোট পাতা লেগে রয়েছে। বড়োচাচা ভীষণ অবাক হয়ে গেলেন। গলা উঁচিয়ে বললেন, 'কী হয়েছে রে পরী?'

'পান্না পানিতে ডুবে গিয়েছিল। আভা কোনোমতে তুলেছে।' পরী ঘনঘন চোখ মুছতে লাগল।

বড়োচাচা বললেন, 'তুলেই তো ফেলেছে, তবু কাঁদছিস!'

বড়োচাচা হাসতে লাগলেন। পরীর কাণ্ড দেখে বেশ মজা লাগছে তাঁর। তিনি এক বার ভাবলেন জিজ্ঞেস করেন, পরী নিজেই যে ছোটবেলায় পুকুরে ডুবে মরতে বসেছিল, সেটি কি তার মনে আছে? কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না। নিঃশব্দে নিজের ঘরে চলে গেলেন। তাঁকে এখন খুব হাসিখুশি দেখাচ্ছে।

তেইশ বছর আগে একবার পরী ডুবতে বসেছিল। তাকে সেদিন টেনে তুলেছিল পরীর বড়োচাচী। তেইশ বছর পর আবার এক জন পরীর মেয়েকে টেনে তুলল। বাহ্‌! বেশ মজার ব্যাপার তো। কিন্তু পরীর কি সেই শৈশবের কথা মনে আছে? অনেক বড়ো বড়ো ঘটনা মানুষ চট করে ভুলে যায়। আবার অর্থহীন সামান্য অনেক অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার মানুষের অন্তরে দাগ কেটে বসে যায়।

বড়োচাচার এগার বছরের বিবাহিত জীবনে কত বড়ো বড়ো ঘটনাই তো ঘটেছে। কিন্তু সে-সব ছবি বড়ো ঝাপসা। কষ্ট করে দেখতে হয়, ঠিক ঠিক মনে পড়তে চায় না। শিরীন মরবার সময় তাঁকে যেন কী সব বলেছিল। সে-সব কেমন আবছাভাবে মনে আসে। এমন কি শিরীনের চেহারাও ঠিকঠিক মনে পড়ে না। কিন্তু একটি ছোট্ট ঘটনা, একটি অতি সামান্য ব্যাপার, আজও কী পরিষ্কার ভাবে মনে আছে তাঁর।

সেদিন ভীষণ গরম পড়েছে। দুপুরে একটু ঘুমিয়েছিলেন। ঘেমে একেবারে নেয়ে গেছেন। ঘুম যখন ভাঙল, তখন বেলা পড়ে গেছে।

তিনি বারান্দার ইজিচেয়ারে এসে বসেছেন। একটি কাক কোত্থেকে এসে কা-

কা শুরু করেছে। তিনি হাত নেড়ে কাক তাড়িয়ে দিলেন, সেটি আবার উড়ে গেল, আর ঠিক তখনি শুনলেন ঘরে ভেতর থেকে শিরীন খুব মৃদু স্বরে সুর করে বলছে, 'রসুন বুনেছি, রসুন বুনেছি।'

কত দিন হয়ে গেল, তবু তাঁর মনে হয় যেন সেদিনের ঘটনা। কাকটির তাকানর ভঙ্গিটিও তাঁর মনে আছে। এ রকম হয় কেন মানুষের? বড়ো বিচিত্র মন আমাদের।

বড়োচাচা দুপুরের খাবার খেতে আনিসের ঘরে চলে গেলেন। আনিস অসুস্থ হয়ে এখানে পড়ে আছে প্রায় এগার মাস। এই এগার মাসের প্রতি দুপুরে তিনি আনিসের সঙ্গে খেতে বসেছেন। খাওয়ার ঘন্টাখানিক সময় তিনি আনিসের ঘরে কাটান। এটা-সেটা নিয়ে হালকা গল্পগুজব করেন। আজ ঘরে ঢুকে দেখলেন খাবার দিয়ে গিয়েছে এবং আনিস গোগ্রাসে খাচ্ছে। সে চাচাকে দেখে লজ্জিত হয়ে বলল, 'বড়ো খিদে পেয়েছে চাচা।'

'খিদে পেলে খাবি। আমার জন্য অপেক্ষা করতে হবে নাকি রে গাধা।'

'আপনি হাত ধুয়ে আসুন।'

'তোর শরীর কেমন বল?'

'ভালো।'

'ব্যথা হয় নি, না?'

'সকালের দিকে অল্প হয়েছিল, এখন নেই।'

বড়োচাচা খেতে বসে আনিসের দিকে বারবার তাকাতে লাগলেন। আনিসের চেহারায় তার বাবার চেহারার আদল আছে। খুব পুরুষালি গড়ন। তবে মেয়েদের মতো ছোট্ট বরফি-কাটা চিবুক। এইটুকুতেই তার চেহারায় অনেকখানি ছেলেমানুষী এসে গেছে। আনিস বলল, 'বড়োচাচা, আপনার সানাই শুনে আজ জেগেছি।'

সানাইয়ের কথায় বড়োচাচার মন খারাপ হয়ে গেল। তিনি যেমন হবে ভেবেছিলেন, তেমনি হয় নি। তিনি চেয়েছিলেন বিয়ের এই আনন্দ-উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে একটি সকরুণ সুর কাঁদতে থাকুক। সবাইকে মনে করিয়ে দিক এ-বাড়ির সবচেয়ে আদরের একটি মেয়ে আজ চলে যাচ্ছে। আর কখনো সে জ্যোৎস্নারাতে ছাদে দাপাদাপি করে ভুল সুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবে না। কিন্তু তিনি যেমন চেয়েছিলেন, তেমনি হল না। অল্প বেলা বাড়তেই তুমুল হৈচৈ-এ সানাইয়ের সুর ডুবে গেল। তিনি মনমরা হয়ে রেডিওগ্রাম বন্ধ করে দিলেন।

বড়োচাচা হাত ধুয়ে এসে বসলেন আনিসের বিছানায়। আচমকা প্রশ্ন করলেন, 'তোর কি খুব খরাপ লাগছে আনিস?'

'কই? না তো!'

'আমেরিকা থেকে ফিরে এসে একটা সাদাসিধা ভালো মেয়ে বিয়ে করিস

www.MurchOna.com

তুই।'

আনিস হেসে ফেলল। বড়োচাচা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'হাসির কী হল? হাসছিস কেন?'

'আমি আর বাঁচব না। দিস ইজ এ লস্ট গেম।'

বড়োচাচা কথা বললেন না। আনিসের সিগারেট খেতে ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু বড়োচাচা না যাওয়া পর্যন্ত সেটি সম্ভব নয়। সে অপেক্ষা করতে লাগল, কখন তিনি ওঠেন, কিন্তু তিনি উঠলেন না। আনিসের সিগারেট–পিপাসা আরো বাড়িয়ে দিয়ে একটি চুরুট ধরালেন। আনিসের দিকে সরু চোখে তাকিয়ে বললেন, 'কোনো কারণে আমার ওপর তোর কি কোনো রাগ আছে?'

'কী যে বলেন চাচা! রাগ থাকবে কেন?'

'না, সত্যি করে বল।'

'কী মুশকিল, আমি রাগ করব কেন? কী হয়েছে আপনার বলুন তো।'

'আমার কিছু হয় নি।'

বড়োচাচা হঠাৎ ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। কাল রাত থেকে তাঁর মনে হচ্ছিল, আনিসের মনে তাঁর প্রতি কিছু অভিমান জমা আছে। আনিস যদিও এখন হাসছে, তবু সেই হাসিমুখ দেখে তাঁর কষ্ট হতে থাকল। তিনি নিজের মনে খানিকক্ষণ বিড়বিড় করলেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে 'যাই আনিস' বলে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

বড়োচাচা হচ্ছেন সেই ধরনের মানুষ, যাঁরা সামান্য ব্যাপারে অভিভূত হন না। আজ আনিসকে দেখে তিনি অভিভূত হয়েছেন। তিনি চাইছিলেন কিছু একটা করেন, কিন্তু কী করবেন তা তাঁর জানা নেই। আনিসের জন্যে তাঁর একটি গাঢ় দুর্বলতা আছে। নিজের দুর্বলতাকে তিনি কোনো কালেই প্রকাশ করতে পারেন না। প্রকাশ করবার খুব একটা ইচ্ছাও তাঁর কোনো কালে ছিল না। কিন্তু আজ তাঁর মন কাঁদতে লাগল। ইচ্ছে হল এমন কিছু করেন যাতে আনিস বুঝতে পারে এই গৃহে তার জন্যে একটি কোমল স্থান আছে। কিন্তু আনিস বড় অভিমানী হয়ে জন্মেছে। তার জন্যে কিছু করা সেই কারণেই হয়ে ওঠে না।

খুব ছোটবেলায় আনিসের যখন এগার–বার বৎসর বয়স, তখনই বড়োচাচা আনিসের তীব্র অভিমানের খোঁজ পান। বড়ো হয়েছে বলে আনিস তখন আলাদা ঘরে ঘুমায়। তার ঘরটি একতলায়। পাশের ঘরে আনিস, জরী ও পরীদের মাষ্টার সাহেব থাকেন। এক রাত্রিতে খুব ঝড়–বৃষ্টি হচ্ছে। বড়োচাচা আনিসের ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় শুনলেন আনিস কাঁদছে। তিনি ডাকলেন, 'আনিস, কী হয়েছে রে?'

আনিস ফুঁপিয়ে বলল, 'ভয় পাচ্ছি।'

'আয় আমার ঘরে। আমার সঙ্গে থাকবি?'

'না।'

www.murchona.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

'তাহলে আমি সঙ্গে শুই?'

'না।'

'দরজা খোল তুই।'

আনিস দরজা খুলল না। তিনি অনেকক্ষণ বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বড়োচাচার মনে হল জরীর বিয়ের এই দিনটি আনিসের জন্যে খুব একটা দুঃখের দিন। কিন্তু তাঁর কিছুই করবার নেই।

যে-ছেলেটির সঙ্গে জরীর বিয়ে হচ্ছে, তার খোঁজ বড়োচাচাই এনেছিলেন। তাঁর আবাল্যের বন্ধু আশরাফ আহমেদের বড়ো ছেলে। নম্র ও বিনয়ী। লাজুক ও হৃদয়বান। দেখতে আনিসের মতো সুপুরুষ নয়। রোগা ও কালো। জরীর বাবা আপত্তি করেছিলেন। বারবার বলেছেন, 'ছেলের ধরনধারণ যেন কেমন।' জরীর মারও ঠিক মত নেই। মিনমিন করে বলেছেন, 'ইউনিভার্সিটির মাষ্টার, কয় পয়সা আর বেতন পায়?' কিন্তু বড়োচাচার প্রবল মতের বিরুদ্ধে কোনো আপত্তিই টিকল না। তাঁর যুক্তি হচ্ছে জরীর মতো একটি ভালো মেয়ের জন্যে এ-রকম এক জন ভাবুক ছেলেই দরকার, যে গল্প-কবিতা লেখে--জরী সুখ পাবে। কিন্তু আপত্তি উঠল সম্পূর্ণ ভিন্ন জায়গা থেকে। বড়োচাচা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

তিনি সেদিন শয্যাশায়ী। দাঁতের ব্যথায় কাতর। সন্ধ্যাবেলা ঘরের বাতি জ্বালেন নি। অন্ধকারে শুয়ে আছেন। জরী এসে কোমল গলায় ডাকল, 'বড়োচাচা।'

'কি জরী?'

'আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছি।'

বড়োচাচা বিছানায় উঠে বসলেন। বিস্মিত হয়ে বললেন, 'বাতি জ্বালা, জরী।'

'না, বাতি জ্বালাতে হবে না।'

জরী এসে বসল তাঁর পাশে। তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'কী হয়েছে, জরী?'

'বড়োচাচা, আমি--'

'বল, কী ব্যাপার!'

জরী থেমে থেমে বলল, 'বড়োচাচা, আমি ঐ ছেলেটিকে বিয়ে করব না।'

'কেন, কী হয়েছে?'

'বড়োচাচা, আমি আনিস ভাইকে বিয়ে করতে চাই।'

জরী কাঁদতে লাগল। বড়োচাচা স্তম্ভিত হয়ে বললেন, 'আনিস জানে?'

জরী ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'জানে। তাকে আসতে বলেছিলাম, তার নাকি লজ্জা লাগে।'

দু' জনেই বেশ কিছু সময় চুপচাপ কাটাল। বড়োচাচা এক সময় বললেন, 'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

সে-রাতে তিনি একটুও ঘুমুতে পারলেন না। অনেক বার তাঁর ইচ্ছে হল তিনি আনিসের কাছে যান, কিন্তু তিনি নিজের ঘরেই বসে রইলেন। তাঁর অনেক পুরনো

www.MurchOna.com

কথা মনে পড়তে লাগল।

জরীর অনেক অদ্ভুত আচরণ অর্থবহ হল। একটি মেয়ে তো শুধু শুধু একা ছাদে বসে কাঁদতে পারে না। সে চোখের জলের কোনো–না–কোনো কোমল কারণ থাকে। আশ্চর্য। এ সব তার চোখ এড়িয়ে গেল কী করে?

বিয়ে বড়োচাচাই ভেঙে দিয়েছিলেন। যদিও কাউকেই বলেন নি, এত আগ্রহ যে–বিয়ের জন্য ছিল হঠাৎ তা উবে গেল কেন।

আজ জরীর বিয়ে হচ্ছে। এবং আশ্চর্য, সেই ছেলেটির সঙ্গেই। মাঝখানে একটি ভালোবাসার সবুজ পর্দা দুলছে ঠিকই, কিন্তু তাতে কী? জীবন বহতা নদী। একটি মৃত্যুপথযাত্রী যুবকের জন্যে তার গতি কখনো থেমে যায় না। থেমে যাওয়া উচিত নয়।

বড়োচাচার কষ্ট হতে লাগল। জরীর জন্য কষ্ট। আনিসের জন্য কষ্ট। এবং সেই সঙ্গে তাঁর মৃতা স্ত্রীর জন্যে কষ্ট। তাঁর ইচ্ছে হল আবার আনিসের ঘরে যান। তার মাথায় হাত রেখে মৃদু গলায় বলেন, 'আনিস তোর মনে আছে, এক বার আমার সঙ্গে জন্মাষ্টমীর মেলায় গিয়েছিলি, সেখানে—'

তিনি আবার আনিসের ঘরে ফিরে এলেন।

আনিস পা দোলাতে দোলাতে সিগারেট টানছিল। বড়োচাচাকে দেখে সে সিগারেট লুকিয়ে ফেলল।

'কিছু বলবেন চাচা?'

'না–না, কিছু বলব না।'

বড়োচাচা আবার ফিরে গেলেন।

দুপুরের রোদ সরে গেছে।

শীতের বিকেল বড্ড দ্রুত এসে যায়। বেলা তিনটে মোটে বাজে, এর মধ্যেই গাছের ছায়া হয়েছে দীর্ঘ, রোদ গিয়েছে নিভে। বৈকালিক চায়ের যোগাড়ে ব্যস্ত রয়েছেন জরীর মা। হাতে সময় খুব অল্প, সন্ধ্যা সাতটার আগেই বরযাত্রী এসে যাবে। তারা খবর পাঠিয়েছে, ন'টার মধ্যেই যেন সব শেষ করে কনে বিদায় দিয়ে দেওয়া হয়।

রান্নাবান্না হয়ে গিয়েছে। ছাদে টেবিল–চেয়ার সাজানও শেষ। এক শ' বরযাত্রীকে এক বৈঠকেই খাইয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। বাড়ির সামনে ডেকোরেটররা চমৎকার গেট বানিয়েছে। সন্ধ্যার পরপরই ইলেকট্রিক বাল্বের আলোয় সেই গেট ঝলমল করবে।

জরীর বাবার অফিস সুপারিনটেনডেন্ট কি মনে করে যেন দুপুরবেলাতে এসে পড়েছেন। জরীর বাবা সারাক্ষণ তাঁর সঙ্গেই আছেন। জরীর মার হাতে যদিও কোনো কাজ নেই তবু তিনি মুহূর্তের জন্যেও ফুরসত পাচ্ছেন না। আজ তাঁর গোসলও করা

www.MurchOna.com

হয় নি, দুপুরের খাওয়াও হয় নি। সারাক্ষণই ব্যস্ত হয়ে ঘুরঘুর করছেন।

এখন তাঁর প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। তবু এই মাথাধরা নিয়েই বিরাট এক কেৎলি চা বানিয়ে নিয়ে এসেছেন।

পাড়ার মেয়ে এবং জরীর বন্ধুরা জরীকে ঘিরে বসেছিল। চা আসতেই অকারণ একটা ব্যস্ততা শুরু হল। কনক বলল, 'জরী, তুই চা খাবি এক কাপ?'

'না, আমার শরীর খারাপ লাগছে।'

'খা না এক ঢোক।'

চায়ে প্রচুর চিনি ও এলাচ দেয়ায় পায়েসের মতো গন্ধ। তবু চমৎকার লাগছে খেতে। জরীর মা বললেন, 'চপ আনতে বলেছি। যে কয়টা পার খেয়ে নাও সবাই--রাতে খেতে দেরি হবে।'

আবার একটা হুল্লোড় উঠল।

কন্যাপক্ষীয় মেহমানদের আসবার বিরাম নেই। রিকশা এসে থামছে। হাসিমুখে নামছে চেনা লোকজন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মিশে যাচ্ছে বিয়েবাড়ির স্রোতে। এ-রকম একটা উৎসবে কাউকেই আলাদা করে চেনা যায় না। সবাই বাড়ির লোক হয়ে যায়। আনিসের মা তাই রিকশা থেকে নেমে হকচকিয়ে গেলেন।

আনিসের মা যে আসবেন তা সবাই জানত। তাঁকে চিঠি লিখে জানান হয়েছে, আনিস সতের তারিখে আমেরিকা যাচ্ছে, জটিল অপারেশন হবে, একবার যেন তিনি আসেন। সেই চিঠি পেয়ে আনিসের মা যে এত আগেভাগে এসে পড়বেন, তা কেউ ভাবে নি।

অনেক দিন পরে দেখা, তবু জরীর মা ঠিকই চিনলেন। চিনলেও না চেনার ভান করলেন। বললেন, 'আপনাকে চিনতে পারলাম না তো!'

আনিসের মা কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, 'আমি আশরাফী, আনিসের মা।'

তাঁর স্বামী ভদ্রলোকটি মোটাসোটা ধরনের গোবেচারা ভালোমানুষ। তিনি বিনীত হেসে বললেন, 'আপা, ভালো আছেন? কার বিয়ে?'

'আমার সেজো মেয়ের।'

বলতে গিয়ে জরীর মার একটু লজ্জা লাগল। কারণ পরীর বিয়ের সময় এদের কোনো খবর দেন নি, জরীর বিয়েতেও না। জরীর মা বললেন, 'আপনারা হাত-মুখ ধোন। আনিসের সঙ্গে দেখা করলে দোতলায় যান।'

আনিসের মা দোতলায় উঠলেন না। তাঁর হয়তো কোনো কারণে লজ্জা বোধ হচ্ছিল। বিয়েবাড়িতে অতিথি হিসেবেও নিজেকে অবাঞ্ছিত লাগছে। কিন্তু তাঁকে তো আসতেই হবে। কারণ, এই বাড়িতে তাঁর একটি অসুস্থ ছেলে আছে। সেই ছেলেটি একসময় এতটুকুন ছিল। দু'টি ছোট ছোট দুধদাঁত দেখিয়ে অনবরত হাসত। কথা শিখল অনেক বয়সে। তাও কি, 'ম' বলতে পারত না। আম্মাকে ডাকত 'আন্না' বলে।

www.MurchOna.com

আহ্, চোখে জল আসে কেন?

পুরনো কথায় বড়ো মন খারাপ হয়ে যায়। তিনি ছোট ছোট পা ফেলে ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এ বাড়ির লোকজন অনেকেই আজ তাঁকে চিনতে পারছে না, এও এক বাঁচোয়া। চিনতে পারলে আরো খারাপ লাগত। মাঝবয়েসী এক মহিলা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি জরীর কী হন?'

তিনি থতমত খেয়ে কি একটা বললেন। লোকজনের সঙ্গ ছেড়ে চলে গেলেন ভেতরের দিকে।

এ বাড়ির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তিনি যখন বউ হয়ে আসেন, তখন দোতলায় একটিমাত্র ঘর ছিল, সেখানে বড়ো ভাসুর থাকতেন। পুকুরপাড়েও কোনো আলাদা ঘর ছিল না। বাড়ির কোনো নামও ছিল না। লোকে বলত 'উকিলবাড়ি'। রিকশা থেকে নেমেই পিতলের নেমপ্লেটে বাড়ির নাম দেখলেন 'কারা কানন'। কে রেখেছে এ নাম কে জানে! বোধহয় বড়ো ভাসুর। এ বাড়ি এখন আর চেনা যায় না। অনেক সুন্দর হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ফুলের বাগানটি নষ্ট হয়ে গেছে। গোলাপঝাড়ে মাত্র অল্প ক'টি ফুল দেখছেন। অথচ একসময় অগণিত গোলাপ ফুটত।

এই গোলাপ নিয়েই কত কাণ্ড। আনিসের বাবার শখ হল গোলাপ দিয়ে খাঁটি আতর বানাবেন। রাশি রাশি ফুল কুচিকুচি করে পানিতে চোবান হল। সেই পানি জ্বাল দেয়া হল সারা দিন। সন্ধ্যাবেলা আতর তৈরি হল, বোটকা গন্ধে তার কাছে যাওয়া যায় না। বাড়িতে মহা হাসাহাসি। আনিসের বাবার মনমরা ভাব কাটাবার জন্যে তিনি সে-আতর মাখলেন। সেই থেকে তার নাম হয়ে গেল 'আতর বৌ'! কী লজ্জা কী লজ্জা! বড়ো ভাসুর পর্যন্ত আতর বৌ বলে ডাকতেন। পরী তখন সবে কথাবলা শিখেছে। 'র' বলতে পারে না, সে ডাকত 'আতল, আতল'। আজ কি সেই পুরনো স্মৃতিময় নাম কারো মনে আছে? জরীর মা যখন নাম জানতে চাইলেন, তখন তিনি কেন সহজ সুরে বললেন না, আমি আতর বৌ?

না, আজ তা সম্ভব নয়। এ বাড়িতে আতর বৌ বলে কেউ নেই। পুরনো দিনের সব কথা মনে রাখতে নেই। কিছু কিছু কথা ভুলে যেতে হয়। তিনি হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির পিছনের খোলা জায়গাটায় এসে পড়লেন। এখানে একটি প্রকাণ্ড পেয়ারাগাছ ছিল, 'সৈয়দী পেয়ারা' বলত সবাই। ভেতরটা লাল টুকটুক। গাছটি আর নেই। আতর বৌ হাঁটতে হাঁটতে পুকুরপাড়ে চলে গেলেন। কী পরিষ্কার পানি, আয়নার মতো ঝকঝক করছে। পুকুরপাড়ের ঘাটটি বাঁধান। তাঁর সময় বাঁধান ছিল না। সে-সময় কাঠের তক্তা দিয়ে ঘাট বাঁধা ছিল। শ্যাওলা জমে পিচ্ছিল হয়ে থাকত সে-ঘাট। পা টিপে টিপে পানিতে নামতে হ'ত। এক বার তো পিছলে পড়ে হাত কেটে গেল অনেকখানি। রক্ত বন্ধ হয় না কিছুতেই, শাড়ি দিয়ে হাত চেপে ধরে ঘরে উঠে এসেছেন। সারা শাড়ি রক্তে লাল। দেখতে পেয়ে আনিসের বাবা সঙ্গে সঙ্গে ফিট।

www.MurchOna.com

এমন জোয়ান মানুষ, অথচ একটু-আধটু রক্ত দেখলেই হয়েছে কাজ। আতর বৌ ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন।

তাঁর ক্ষণিকের জন্য মনে হল এ বাড়ি থেকে চলে গিয়ে তিনি ভুল করেছেন। এখানে থাকলে জীবন এমন কিছু মন্দ কাটত না। পরমুহূর্তেই এ-চিন্তা ঘেঁটে ফেললেন। পুরনো জায়গায় ফিরে আসবার জন্যই এ-রকম লাগছে হয়তো। তিনি আসলে মোটেই অসুখী নন। তাঁর স্বামী ও পুত্র-কন্যাদের নিয়ে কোনো গোপন দুঃখ নেই। নিজের চারদিকে নতুন জীবনের সৃষ্টি করেছেন। সেখানে দুঃখ, হতাশা ও গ্লানির সঙ্গে সঙ্গে ভালোবাসাও আছে। শুধু যদি আনিস তাঁর সঙ্গে থাকত! ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হেসেখেলে বড়ো হ'ত।

কিন্তু এ-বাড়ির সবাই অহংকারী ও নিষ্ঠুর। আনিসকে তারা কিছুতেই ছাড়ল না। অবিমিশ্র সুখী কখনো বোধহয় হতে নেই।

'আতর বৌ এসেছ?'

আতর বৌ চমকে দেখলেন--বড়ো ভাসুর, নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি হাসিমুখে বললেন, 'তুমি বড়ো রোগা হয়ে গেছ আতর বৌ!'

তাঁর মুখে পুরনো দিনের ডাক শুনে আতর বৌ-এর চোখে পানি এল। বড়ো ভাসুর বললেন, 'তোমার ছেলেমেয়েরা সবাই ভালো?'

'জ্বি, ভালো।'

'তাদের নিয়ে আসলে না কেন, দেখত তাদের আনিস ভাইকে।'

'আপনি তো চিঠিতে তাদের আনবার কথা লেখেন নি।'

আতর বৌ আঁচলে চোখ মুছলেন। বড়ো ভাসুর বললেন, 'কাঁদছ কেন?'

'না, কাঁদছি না।'

'আনিসের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার?'

'না।'

'তাহলে তার পাশে গিয়ে একটু বস। তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দাও। আজ আনিসের বড়ো দুঃখের দিন।'

আতর বৌ বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কেন? আজ দুঃখের দিন কেন?'

বড়ো ভাসুর চুপ করে রইলেন। অনেক দিন পর আতর বৌকে দেখে তাঁর বড়ো ভালো লাগছে। তিনি হঠাৎ কী মনে করে বললেন, 'আতর বৌ, আনিসের বাবাকে কখনো স্বপ্নে দেখ?'

আতর বৌ খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থেকে শান্ত গলায় বললেন, 'দেখি।'

'তুমি কিছু মনে করলে না তো?'

'না, কিছু মনে করি নি। স্বপ্নের কথা কেন জিজ্ঞেস করলেন?'

'এম্নি করেছি। কোনো কারণ নেই।'

www.MurchOna.com

আনিস লোকটিকে সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল। আগে আরো দু'-এক বার দেখা হয়েছে। আজ যদিও অনেক দিন পরে দেখা, তবু চিনতে একটুও দেরি হল না। লোকটি ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিল। আনিসকে তাকাতে দেখে মৃদু গলায় বলল, 'ভেতরে আসব?'

'আসুন।'

লোকটি ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়াল। মাথার চুল পেকে গেছে। কপালের চামড়া কোঁচকান। চোখ দু'টি ভাসা-ভাসা। সমস্ত মুখাবয়বে একটা ভালোমানুষী আত্মভোলা ভঙ্গি আছে।

'আমি একটু বসলে তোমার অসুবিধে হবে?'

'বসুন বসুন। অসুবিধে হবে কেন?'

'আমাকে চিনতে পেরেছ তো বাবা?'

'হ্যাঁ।'

'আমি তোমার মাকে নিয়ে এসেছি।'

আনিস চুপ করে রইল। লোকটির বসবার ধরন কেমন অদ্ভুত। পা তুলে পদ্মাসন হয়ে চেয়ারে বসেছেন। সারাক্ষণই হাসছেন আপন মনে। আনিস কী কথা বলবে ভেবে পেল না। দু' জন লোক চুপচাপ কতক্ষণ বসে থাকতে পারে? একসময় আনিস বলল, 'আপনার ছেলেমেয়ে কয়টি?'

'দুই মেয়ে এক ছেলে। বড়ো মেয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, কেমিস্ট্রিতে অনার্স, এইবার সেকেণ্ড ইয়ার।'

ছেলেমেয়েদের কথা বলতে পেরে ভদ্রলোকের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি ঝুঁকে এলেন আনিসের দিকে। গাঢ় স্বরে বলতে লাগলেন, 'বড়ো মেয়ের নাম নীলা, তোমার মা রেখেছেন। ছোট মেয়ের নাম আমি রেখেছি ইলা। ছেলেটির নাম শাহীন।'

ভদ্রলোক মহা উৎসাহে পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালেন। তেমনি অন্তরঙ্গ সুরে বলতে লাগলেন, 'গত ঈদের সময় নীলা তোমাকে একটা ঈদকার্ড পাঠিয়েছিল। নিজেই এঁকেছে, নদীতে সূর্যাস্ত হচ্ছে। দু'টি বক উড়ে যাচ্ছে। তুমি পাও নি বাবা?'

'পেয়েছিলাম।'

'নীলা ভেবেছিল, তুমিও তাকে একটা পাঠাবে। সে রোজ জিজ্ঞেস করত--বাবা, তোমার ঠিকানায় আমার কোনো ঈদকার্ড এসেছে?'

আনিস লজ্জা পেল খুব। লজ্জা ঢাকবার জন্য জিজ্ঞেস করল, 'ইলা কত বড়ো হয়েছে?'

'ক্লাস নাইনে পড়ে। বৃত্তি পেয়েছে নন-রেসিডেনশিয়াল।'

'দেখতে কেমন হয়েছে?'

'আমার কাছে খুব ভালো লাগে। তবে শ্যামলা রং। নাকটা একটু চাপা। স্কুলের

মেয়েরা তাকে চায়না ডেকে ক্ষেপায়।'

আনিস হো-হো করে হেসে ফেলল। নীলা ও ইলার সঙ্গে দেখা হলে খুব ভালো হ'ত। আনিস মনে মনে ভাবল, ইলার সঙ্গে যদি কখনো দেখা হয় তাহলে সে বলবে--

ইলা হল চায়না
ব্যাঙ ছাড়া খায় না।

ভদ্রলোক বললেন, 'তোমার ভাই-বোনগুলির খুব শখ ছিল তুমি কিছুদিন তাদের সঙ্গে থাক। এক বার তোমার মা খুব করে লিখেছিল, ঠিক না?'

আনিস লজ্জিত হয়ে মাথা নাড়ল। তার মা সেবার শুধু চিঠিই লেখেন নি, এক শ'টি টাকাও পাঠিয়েছিলেন। সে টাকা ফেরত পাঠান হয়েছিল।

ভদ্রলোক উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগলেন, 'ইলা আবার কবিতাও লেখে। স্কুল-ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছে তার কবিতা--"রুগ্ণ হওয়ার রহস্য" কবিতার নাম। ভীষণ হাসির কবিতা। দাঁড়াও তোমাকে শোনাই। আমার মনে আছে কবিতাটি।'

ভদ্রলাক চেয়ার থেকে পা নামিয়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে আবৃত্তি করতে লাগলেন--

'কয়েক হাঁড়ি পাটালী গুড়
সঙ্গে কিছু মিষ্টি দই,
সেরেক খানি চিঁড়ে ছাড়াও
লাগবে তাতে ভাল খই......কি, সবটা বলব?'

আনিস সে-কথার জবাব দিল না, ঘোলাটে চোখে তাকাল। তার নিঃশ্বাস ভারি হয়ে এসেছে। ভদ্রলোক উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, 'কী হয়েছে বাবা? তুমি খুব ঘামছ!'

সে-ব্যথাটি আবার শুরু হয়েছে। পা দুটো কেউ যেন জ্বলন্ত আগুনে ঠেসে ধরল। আনিস গোঙাতে শুরু করল। ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। মৃদু স্বরে ডাকলেন, 'ও বাবা শোন, ও আনিস।'

আনিস বিকৃত স্বরে বলল, 'আপনি এখন যান। একা থাকতে দিন আমাকে।'

ভদ্রলোক নড়লেন না। একটা হাত-পাখা নিয়ে সজোরে বাতাস করতে লাগলেন। মাঝে মাঝে বলতে লাগলেন, 'পানি খাবে বাবা? মাথায় হাত বুলিয়ে দেব?'

আনিস কথা বলতে পারছিল না। ভদ্রলোক অসহায় গলা বললেন, 'কেউ কি এক জন ডাক্তার ডেকে আনবে, আহা বড় মায়া লাগে।'

আনিসের মা ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি সেখান থেকে দেখলেন, আনিস চোখ বন্ধ করে বিছানায় পড়ে আছে আর ইলা-নীলার বাবা প্রবল বেগে হাওয়া করছেন। আনিসের মা ঘরের ভেতর ঢুকলেন না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন বাইরে। শুনলেন ইলার বাবা মৃদুস্বরে বলছেন, 'ইয়া রহমানু, ইয়া রহিমু, ইয়া

www.MurchOna.com

মালিকু...'

তখন নিচে তুমুল হৈচৈ-এর সঙ্গে 'বর এসেছে বর এসেছে' শোনা গেল, আতর বৌ নিচে নামলেন। তাঁকে এক জন ডাক্তার খুঁজতে হবে। আনিসের জন্য এক জন ডাক্তার প্রয়োজন।

একটি লাজুক, ভদ্র ও বিনয়ী ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল জরীর। মুসলমানদের বিয়ে বড় বেশি সাদাসিধা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই উৎসবের সমাপ্তি। যে-ছেলেটির সঙ্গে কোনো জন্মেও জরীর পরিচয় ছিল না, তার সঙ্গে পরম পরিচয়ের অনুষ্ঠানটি এত ক্ষুদ্র হতে দেখে ভালো লাগে না। মন খারাপ হয়ে যায়। মনে হয় কী-যেন একটা বাকি থেকে গেল।

জরীর দিকে চোখ তুলে তাকান যায় না। শ্যামলা রংয়ের এই মেয়েটি এত রূপ কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল! দেখে দেখে বুকের ভেতরে আশ্চর্য এক ব্যথার অনুভূতি হয়। ভয় হয়, সেই লাজুক, ভদ্র ও বিনয়ী ছেলেটি কি এই রূপের ঠিক মূল্য দেবে? হয়তো দেবে, কারণ ছেলেটি কবি, মাঝে মাঝে গল্পও লেখে। হয়তো দেবে না, না চাইতে যা পাওযা যায় তার তো কোনো কালেই কোনো মূল্য নেই।

জরী বসে আছে সম্রাজ্ঞীর মতো। তার যে-বন্ধুরা এতক্ষণ ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছিল, তারা এখন খানিকটা দূরে সরে বসেছে। বিয়ের পরপরই অবিবাহিত মেয়েদের থেকে বিবাহিতরা আলাদা হয়ে পড়ে। আভা জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগছে জরী?'

জরী হাসল। কনক বলল, 'আমার এখনো বিশ্বেস হচ্ছে না, তোর বিয়ে হয়ে গেছে।'

জরীর মা ক্লান্ত ও অবশ ভঙ্গিতে পাশেই বসে। বিয়ে হয়ে যাবার পর থেকেই তিনি অবিশ্রান্ত কাঁদছেন। জরী অনেকটা সহজ হয়েছে, হালকা দু'-একটা কথাও বলছে। বরের ছোট বোন জরীকে নিয়ে কী-একটা রসিকতা করায় সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে জরীও হেসেছে। একসময় সে বলল, 'মা, বড়োচাচা কোথায়?'

'আনিসের ঘরে, আনিসের অসুখটা খুব বেড়েছে। ডাকব তোর চাচাকে?'

'না। আনিস ভাইয়ের মার সঙ্গে একটু আলাপ করব।'

আতর বৌ ছেলের কাছে ছিলেন না। বারান্দায় একা একা দাঁড়িয়ে ছিলেন। জরী ডাকছে শুনে ঘরে এলেন। জরী বলল, 'ভালো আছেন চাচী?'

'হ্যাঁ মা।'

জরী হঠাৎ তাঁর পা ছুঁয়ে সালাম করল। আতর বৌ বললেন, 'স্বামী ভাগ্যে ভাগ্যবতী হও, লক্ষ্মী মা।'

বরের ছোট বোনটি আবার কী-একটা হাসির কথা বলে সবাইকে হাসিয়ে দিল। আতর বৌ বললেন, 'এই ছোট্টটি দেখেছি জরীকে। কি দুষ্টুই না ছিল! এখন

www.MurchOna.com

কেমন বৌ সেজে বসে আছে। অবাক লাগে!'

অনেকেই এসে জড়ো হয়েছে আনিসের ঘরে। বড়োচাচা, হোসেন সাহেব, আনিসের মা, ইলা–নীলার বাবা, আনিসকে যে-ডাক্তারটি চিকিৎসা করেন তিনি, এবং পরী। সবাই চুপ করে আছে। ব্যথায় আনিসের ঠোঁট নীল হয়ে উঠেছে, তার চোখ টকটকে লাল। সে একসময় বিকৃত স্বরে বলল, 'দুলাভাই, আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেন। পেথিড্রিন দেন।'

হোসেন সাহেব আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। বড়োচাচা বললেন, 'হোসেন তুমি পেথিড্রিন দাও।'

হোসেন সাহেব সিরিঞ্জ পরিষ্কার করতে লাগলেন। আনিসের মা থরথর করে কাঁপছিলেন। এক ফাঁকে হোসেন সাহেব তাঁকে বললেন, 'আপনি ভয় পাবেন না, এক্ষুণি ঘুমিয়ে যাবে।'

আনিসের মা বিড়বিড় করে কী বললেন, ভালো শোনা গেল না। ইনজেকশনের পরপরই আনিস পানি খেতে চাইল। রাত কত হয়েছে জানতে চাইল। হোসেন সাহেব বললেন, 'ঘুম পাচ্ছে আনিস?'

'হ্যাঁ।'

আনিসের মা বললেন, 'এখন আরাম লাগছে বাবা?'

'লাগছে।'

আনিসের মা দোওয়া পড়ে ফুঁ দিলেন ছেলের মাথায়। আনিস জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'বাতি নিভিয়ে দাও, চোখে লাগে।'

বাতি নিভিয়ে তারা সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

নিচে জরীর বিদায়ের আয়োজন চলছে। রাত হয়েছে দশটা। বরযাত্রীরা আর এক মিনিটও দেরি করতে চায় না। কিন্তু ক্রমাগতই দেরি হচ্ছে। কনে–বিদায় উপলক্ষে খুব কান্নাকাটি হচ্ছে। জরীর মা দু' বার ফিট হয়েছেন। জরীকে ধরে রেখেছেন।

বর–কনেকে বারান্দায় দাঁড় করিয়ে ছবি তোলা হবে। জরী শেষ বারের মতো বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে--তার ছবি। ভাড়া–করা ফটোগ্রাফার ক্যামেরা স্ট্যান্ডে লাগিয়ে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছে। বর এসে দাঁড়িয়ে আছে কখন থেকে। কনের দেখা নেই। জরীকে বার বার ডাকা হচ্ছে।

ঘরের সব ঝামেলা চুকিয়ে জরী যখন বারান্দায় ছবি তোলবার জন্যে রওয়ানা হয়েছে, তখনি হোসেন সাহেব বললেন, 'জরী, আনিসের সঙ্গে দেখা করে যাও। তার সঙ্গে আর দেখা নাও হতে পারে।'

জরী থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। হোসেন সাহেব বরকে বললেন, 'তুমি আর দু' মিনিট অপেক্ষা কর। এ বাড়ির একটি ছেলে খুবই অসুস্থ, জরী তার সাথে দেখা

www.MurchOna.com

করে যাক।'

'যদি বলেন, তবে আমিও যাব আপনাদের সঙ্গে।'

'না, তোমার কষ্ট করতে হবে না। তুমি একটু অপেক্ষা কর। এস জরী।'

জরীর সঙ্গে অনেকেই উঠে আসতে চাইছিল। কিন্তু হোসেন সাহেব বারণ করলেন, 'দল-বল নিয়ে রোগীর ঘরে গিয়ে কাজ নেই।'

আনিসের ঘর অন্ধকার। বাইরে বিয়েবাড়ির ঝলমলে আলো। সে-আলোয় আনিসের ঘরের ভেতরটা আবছা আলোকিত। জরী ভেতরে এসে দাঁড়াল। হালকা একটি সৌরভ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। জরী কী সেন্ট মেখেছে কে জানে। সে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে মৃদু স্বরে ডাকল, 'আনিস ভাই, আনিস ভাই।'

কেউ সাড়া দিল না। হোসেন সাহেব বললেন, 'বাতি জ্বালাব, জরী?'

'না, না দুলাভাই।'

জরী নিচু হয়ে আনিসের কপাল স্পর্শ করল। ভালোবাসার কোমল স্পর্শ, যার জন্যে একটি পুরুষ আজীবন তৃষিত হয়ে থাকে। হোসেন সাহেব বললেন, 'ছিঃ জরী, কাঁদে না। এস আমরা যাই।'

ঘরের বাইরে বড়োচাচা দাঁড়িয়ে ছিলেন। জরী তাঁকে জড়িয়ে ধরল। তিনি বললেন, 'সব ঠিক হয়ে যাবে মা। ফি আমানুল্লাহ্, ফি আমানুল্লাহ্।'

নিচে তুমুল হৈচৈ হচ্ছিল। জরী নামতেই তাকে বরের পাশে দাঁড় করিয়ে দিল। ক্যামেরাম্যান বলল, 'একটু হাসুন।'

সবই বলল 'হাস জরী, হাস, ছবি উঠবে।'

জরীর চোখে জল টলমল করছে, কিন্তু সে হাসল।

আনিসের ঘুম যখন ভাঙল, তখন কোলাহল স্তিমিত হয়ে এসেছে। সে কতক্ষণ ঘুমিয়েছে, ঠিক বুঝতে পারছে না। জরী কি চলে গিয়েছে নাকি? উঠোনে সারি সারি আলো জ্বলছে।

গেটের বাতিগুলি জ্বলছে-নিভছে। তার বিছানার খানিকটা অংশ বারান্দার বাতিতে আলোকিত হয়ে রয়েছে।

আনিস ঘাড় উঁচু করে জানালা দিয়ে তাকাল। না, বরের গাড়ি এখনো যায় নি। জরী এখনো এই বাড়িতেই আছে! যাবার আগে দেখা করতে এখানে আসবে নিশ্চয়ই। আনিস তখন কী বলবে ভেবে পেল না। খুব গুছিয়ে কিছু একটা বলা উচিত, যাতে জরীর মনের সব গ্লানি কেটে যায়। কিন্তু আনিস কোনো কথাই গুছিয়ে বলতে পারে না।

জরীকে বিয়ের সাজে কেমন দেখাচ্ছে কে জানে? আনিস হয়তো দেখে চিনতেই পারবে না। জরী কি হুট করে তাকে সালাম করে বসবে নাকি? এই একটি বিশ্রী অভ্যেস আছে তার। ঈদের দিন কথা নেই, বার্তা নেই, সেজেগুজে এসে

www.MurchOna.com

টুপ করে এক সালাম। কিছু বললে বলবে--সিনিওরিটির একটা ভ্যালু আছে না? তারপরই খিলখিল হাসি।

আনিস অন্ধকার ঘরে চুপচাপ শুয়ে রইল। ঘড়িতে সাড়ে দশটা বাজে। বরযাত্রীরা তৈরি হয়েছে বিদায় নিতে। সবাই জরীকে ধরাধরি করে উঠোনে নিয়ে এল। রাজ্যের লোক সেখানে এসে ভিড় করেছে। যাবার আগে সবাই একটু কথা বলবে। দু'একটি কী আচার-অনুষ্ঠানও আছে।

আনিস জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে আছে। বরের সাজান গাড়ি ব্যাক করে আরো পিছনে আনা হচ্ছে। গাড়িতে উঠতে যেন কনেকে হাঁটতে না হয়। উপর থেকে জরীর ঝলমলে লাল শাড়ির খানিকটা চোখে পড়ে। খুব আগ্রহ নিয়ে আনিস সেদিকে তাকিয়ে রইল। যাবার আগে জরী নিশ্চয়ই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবে।

'আনিস, আনিস।'

'কে?'

'আমি টিংকুমণি। আমি এসেছি।'

'এস এস।'

'তোমার ব্যথা কমেছ?'

'কমেছে।'

'আচ্ছা।'

সারা দিনের ক্লান্তিতে মেয়েটির মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। চুল এলোমেলো। আজ কেউ তার দিকে নজর দেবার সময় পায় নি। আনিস তাকে বুকের কাছে টেনে নিল। জানালার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ঐ দেখ টিংকু। জরী চলে যাচ্ছে।'

টিংকু সে-কথায় কান দিল না। কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'আমি ব্যথা পেয়েছি, হাত ভেঙে গেছে।'

'আহা আহা! একটু হাতি-হাতি খেলবে টিংকু?'

'না, আমার ঘুম পাচ্ছে।'

ছোট ছোট হাতে আনিসের গলা জড়িয়ে ধরে টিংকু কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল।

ক্রমে ক্রমে রাত বাড়তে লাগল। বাড়ির আলোগুলি নিভে যেতে লাগল। বাগানের গোলাপ আর হাস্নুহেনা-ঝাড় থেকে ভেসে এল ফুলের সৌরভ। অনেক দূরে একটি নিশি-পাওয়া কুকুর কাঁদতে লাগল।

তারও অনেক পরে আকাশে একফালি চাঁদ উঠল। তার আলো এসে পড়ল নিদ্রিত শিশুটির মুখে। জ্যোৎস্নালোকিত একটি শিশুর কোমল মুখ, তার চারপাশে কী বিপুল অন্ধকার। গভীর বিষাদে আনিসের চোখে জল এল। যে-জীবন দোয়েলের, ফড়িংয়ের--মানুষের সাথে তার কোনো কালেই দেখা হয় না।

www.murchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

Nirbason by Humayun Ahmed

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com